বিদেশ-প্রসঙ্গ ১

ভারত ও ইন্দোচীন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

ভূমিকা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি বিচিত্রায় (প্রথমবর্ষ ১৩৩৪) 'ইন্দোচীন ভ্রমণ' শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধগুলির সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করে এখন বইয়ের আকারে প্রকাশ করছি।
২২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়ে
ন ইন্দোচীনে যাই তখন ইন্দোচীনের প্রাচীন হিন্দু-
র্ত্তি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। কিছুদিন খেকে এ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা সুরু হয়েছে এবং অনেকেই এখন যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশগুলির ইতিহাস জানবার জন্য উৎসুক হয়েছেন তা'তে সন্দেহ নই। এই বইয়ে সেই ঔৎসুক্য কতকটা পরিতৃপ্ত
ল আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করব। প্রবন্ধগুলি
াম তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন বলে আমি
চিত্রা'র সম্পাদক মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা
াচ্ছি। ইতি

১৩৫৭ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী।

১

ইন্দোচীনের পথে

সিংহল থেকে জাহাজে চ'ড়ে ইন্দোচীন অভিমুখে যাত্রা করবার সময় যখন ভারতের শেষ নিশানা—কলম্বো-সৈকতের নারিকেলবন চোখের সাম্‌নে দিগন্তে মিলিয়ে গেল, মনে তখন জাগ্‌ছিল ইতিহাসের পুরাণো কথা। সাগরপারের সেই দ্বীপগুলিতে ভারত-সন্তানগণ কবে ও কি ভাবে তাঁদের সভ্যতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাই জান্‌বার উৎসাহে মনটা তখন ভরপুর ছিল। এসিয়ার নানা দেশে ঐ সভ্যতার যে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তার কিয়দংশ দেখে চক্ষু সার্থক করাই ছিল মনের একান্ত কামনা—উদ্দেশ্য ছিল ভারত-ইতিহাসের একটী বড় অধ্যায়ের কিছু উপাদান সংগ্রহ করা।

কলম্বো থেকে পেনাং প্রায় ছ'দিনের পথ। এ ছ'দিন জাহাজে বিশেষ কিছু করবার মত কাজ ছিল না। অসীম জলরাশির দিকে তাকিয়ে প্রভাত ও সন্ধ্যায় প্রকৃতির বিরাট সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ ক'রতাম্, আর ভাব্‌তাম, ভারতসন্তানগণ যখন এই বিশাল সাগর-বক্ষ উত্তীর্ণ হ'য়ে ইন্দোচীনে তাদের উপনিবেশ বিস্তার করেছিলেন তখন তাঁরা হৃদয়ে যে উদারতা পোষণ ক'রতেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তাঁরা উপনিবেশ বিস্তার করেছিলেন—কিন্তু রক্তপাত করেন নি; তাঁরা দেশ ত্যাগ করে এসেছিলেন—কিন্তু পরকে শোষন করবার জন্য নয়; তাঁরা সভ্যতা দিয়েছিলেন—কিন্তু তাই বলে পরের বুকের উপর পাষাণ চাপিয়ে দেন নি। পরের দেশের বাজারে এসে সে-সভ্যতা মুক্তহস্তে তাঁরা বিলিয়েছিলেন, যার পছন্দ হয়েছিল সে ওজন করেই তা' নিয়েছিল ও নিজের অভিরুচি অনুসারে তা' গ'ড়ে তুলেছিল। আজ যখন এই সাগরের উপকূলের দিকে তাকাই তখন দেখি নানা জাতির হা-হুতাশে বাতাস অগ্নিময় হ'য়ে উপকূলভাগ দুঃসহ হয়েছে। এই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী জনসমাকুল নগরসমূহের মন্দিরচূড়া পূর্ব্বে যেখানে অভ্যাগতকে সাদর আহ্বান জানাত এখন

সেখানে শাস্ত্রীর তাড়নায় মানুষের নামতেও ঘৃণা বোধ হয়।

আমরা কত কথাই না ভুলে গিয়েছি। কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্ম্মণ যেদিন ভারতের পতাকা বহন ক'রে এই সাগরের উপর দিয়ে সিংহল থেকে যবদ্বীপে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন, উজ্জয়িনীর পরমার্থ যখন তাঁর পারদর্শী-বিদ্যা নিয়ে ইন্দোচীনে ও চীনে গিয়ে নূতন বাণী প্রচার করেছিলেন—তখন ছিল ভারতের এক স্মরণীয় যুগ।

গুণবর্ম্মণ ছিলেন কাশ্মীরের যুবরাজ। তাঁর পিতা সঙ্ঘানন্দ কুটচক্রীর চক্রান্তে বাধ্য হ'য়ে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে বনবাসী হয়েছিলেন—গুণবর্ম্মণ কাশ্মীরের প্রত্যন্ত-দেশের বনেই তাঁর পিতার ক্রোড়ে শৈশবে পালিত হ'য়ে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করেছিলেন। সঙ্ঘানন্দের মৃত্যুর পর যখন তাঁর শত্রুপক্ষ অন্তর্হিত হ'লেন, তখন মন্ত্রী-পরিষৎ একবাক্যে যুবক গুণবর্ম্মনকে রাজপদে অভিষিক্ত করবার জন্য তাঁকে আহ্বান ক'রলেন। গুণবর্ম্মণ পিতার মুখে বুদ্ধের যে করুণাকাহিনী শুনেছিলেন তা'তে তাঁর রাজপদে অভিষিক্ত হবার বাসনা অনেকদিন থেকেই দূর হ'য়ে গিয়েছিল। তাই তিনি মন্ত্রীপরিষদের

প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য ক'রে "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" বলে প্রচারে বেরিয়ে প'ড়লেন। বোধিসত্ত্বের ত্যাগধর্ম্ম জগতকে শোনাবেন ও পাপীতাপীকে করুণা বিতরণ ক'রে মুক্তির পথে তুলে দেবেন এই হ'ল তাঁর জীবনের একান্ত কামনা। নিখিল বিশ্ব হল তাঁর গৃহ আর সারা জগতের শাক্যপুত্রেরা হ'ল সোদর। তাই দেশ-বিদেশের প্রভেদ তাঁর মন থেকে অপসারিত হ'ল, তিনি কাশ্মীর ছেড়ে সিংহল দ্বীপে গিয়ে উপনীত হ'লেন।

সিংহল ছিল তখন বৌদ্ধ-সাহিত্য আলোচনার একটী বড় কেন্দ্র সেখানে কিছুদিন ধরে তিনি জ্ঞানচর্চ্চা ক'রলেন ; তার পর সিংহল থেকে শ্রেষ্ঠীদের অর্ণবপোতে ভারতমহাসাগর অতিক্রম ক'রে যবদ্বীপে গিয়ে উপনীত হ'লেন। যবদ্বীপ তখন ভারতের উপনিবেশ। সেখানে বহু ভারত-সন্তানের বাস। রাজাও ছিলেন ভারতীয় কোন এক রাজবংশের। তাঁরা দেশ ছেড়ে গিয়ে নূতন দেশমাতৃকার উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। দেবভাষা সংস্কৃতে তাঁদের বহুল অধিকার ছিল এবং তাঁরা তখন সে ভাষার যথেষ্ট চর্চ্চাও ক'রতেন। গুণবর্ম্মণের কাছে রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে তাঁর

উপদেশমত এই নূতন ধর্ম্ম-প্রচারে সাহায্য করতে বদ্ধ-পরিকর হ'লেন। গুণবর্ম্মণ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ক'রলেন। তাঁর নাম চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। চীন দেশের শ্রেষ্ঠীরা সেই খবর দেশে গিয়ে প্রচার ক'রলেন। চীনের বৌদ্ধেরা গুণবর্ম্মণকে নিজেদের দেশে আনবার জন্য সম্রাটের কাছে প্রার্থনা জানালেন। ফলে গুণবর্ম্মণ শীঘ্রই চীনে এসে উপনীত হ'লেন (৪২৪ খৃঃ অঃ) এবং চীনদেশের নানাস্থানে পর্য্যটন ক'রে বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা ও অনেক বৌদ্ধগ্রন্থের চীনা অনুবাদ প্রকাশ ক'রলেন। বুদ্ধের বাণী পৃথিবীর নানাস্থানের শাক্যপুত্রদের কাছে নূতন ক'রে শোনাবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সফল হয়েছিল। অবশেষে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে নান্-কিং নগরের জেতবন-বিহারে তিনি শাক্যপুত্র পরিবেষ্টিত হ'য়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

গুণবর্ম্মণের পর শতাধিক বৎসর ধরে যে-সব ভারত-সন্তানেরা তাঁর পথাবলম্বন করেছিলেন, তার ভিতর সকলের চেয়ে বড় নাম হচ্ছে পরমার্থের। চীন-সম্রাট মগধের রাজার কাছে দূত পাঠালেন। চীনদূত কম্বোজের রাজদূতকে সঙ্গে নিয়ে মগধে এসে উপনীত হ'লেন ও তাঁর প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনা—ভারতীয় একজন

খ্যাতনামা বৌদ্ধপণ্ডিতকে চীনে প্রেরণ করা হোক্। উজ্জয়িনীর পরমার্থের নামই তখন দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। মগধরাজের প্রেরণায় তিনি বহু পুঁথি নিয়ে বিদেশ যাত্রা ক'রলেন। তিনি শ্রমণ, বিদেশ-যাত্রায় মনে কোন দ্বিধা ও ভয় ছিল না; প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সংসারের মোহ কাটিয়েছেন। যেখানেই বুদ্ধের বাণী লোকে শুনতে চাইবে সেখানে যেতেই তাঁর পরম আগ্রহ। ভারতবর্ষ থেকে সমুদ্রপথে রওনা হ'য়ে তিনি ৫৪৬ খৃষ্টাব্দে নান্-কিং নগরে গিয়ে উপনীত হলেন। বৌদ্ধসাহিত্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তর্কশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, সাংখ্য ও যোগও তিনি ভাল ক'রেই অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রায় বিশ বৎসর ধরে তিনি দক্ষিণ-চীনের নানাস্থানে ঘুরে ধর্ম্মালোচনা ও বহু গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করলেন। শেষ বয়সে একবার তাঁর দেশে ফিরিবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এই নূতন দেশ—চীন—তাঁকে ছাড়তে চাইল না; ভীষণ ঝটিকায় প্রতিহত হয়ে তাঁদের অর্ণবপোত চীনের উপকূলে ফিরে এল ও তিনি অবতরণ করতে বাধ্য হলেন। অবশেষে নান-কিং নগরে ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শত শত ভারত-সন্তান এই সমুদ্রের উপর দিয়ে পূর্ব্বদেশে গমন করেছিলেন—একই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁদের মধ্যে এই দু'টী নাম কালের মালায় গাঁথা রয়েছে। ভারতের নিঃস্বার্থপরতার এ-গুলি হচ্ছে জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন—গরিমাময় দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইন্দোচীন সে পুরাণো কাহিনী ভুলে গিয়েছে, যবদ্বীপ সে পুরাণো কাহিনী ভুলে গিয়েছে, চীন এমন বদলেছে যে সে আর ভারতকে পূর্ব্বের মত সাদর আহ্বান করে না। আর সব চেয়ে দুঃখের কাহিনী হচ্ছে—ভারতের। তা'র ইতিহাসের পাতা তিল তিল ক'রে খুঁজ্‌লেও এই সব গৌরবমণির নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কোথায় গুণবর্ম্মণ, কোথায় পরমার্থ—কোথায়ই বা গুণভদ্র? ভারত তা'র এই-সব কৃতী সন্তানের নামও মনে রাখে নি; আঠার আঠার খানি পুরাণ ও উপপুরাণের ভিতর ব্রত-কথা বাড়িয়ে, ফেনিয়ে শোনাতেই সে ব্যস্ত। যে-ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে তা'র গৌরবস্মৃতি চিহ্নিত করা থাক্‌বে, পাতায় পাতায় তা'র পুণ্যকীর্ত্তি সন্তানদের গরিমাময় কার্য্য-কলাপের সত্য বর্ণনা থাক্‌বে ও যা' দেখে তার সন্তানেরা নিত্য নূতন পথ চোখের সাম্‌নে খুঁজে পাবে, সেই

পুরাতন আদর্শ আবার নূতন করে ফুটিয়ে তুল্‌বে, কৈ এমন ইতিহাস ত ভারত রাখে নি! তাই আমরা সেই অতীতের কথা চোখের সাম্‌নে এখনো জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারিনি।

সপ্তাহকাল সমুদ্রে ভাস্‌বার পর আমরা যখন পেনাং বন্দরে পৌঁছুলাম তখন মন অনেকটা হাল্‌কা হ'ল। দু'বেলা সমুদ্র দেখ্‌তে প্রথম ক'দিন বেশ ভালই লাগে, তারপর প্রত্যহই সেই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই পেনাং বন্দরে যখন জাহাজ ভিড়্‌লো তখন মনটা উৎসাহে ভরপূর হয়ে উঠ্‌লো—নূতন স্থানটা ঘুরে দেখে নেব এই ইচ্ছাটা প্রবল ভাবে জাগ্‌ছিল।

পেনাং একটা ছোট দ্বীপ—মালাক্কা উপদ্বীপের কূলে অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্থানটা ইংরাজের হস্তগত হয়। সেই সময় হতে এখানে ব্রিটীশ উপনিবেশ স্থাপিত ও স্থানটী বন্দরে পরিবর্ত্তিত হয়। ইংরাজেরা দ্বীপটীর নূতন নাম রাখেন Prince of Wales' Island; কিন্তু পুরাণো নামটী নূতন নামকে হার মানিয়েছে। ভূগোল বা মানচিত্র ছাড়া নূতন নামটীর আর কোথাও সন্ধান মেলে না। মালয়

ভাষায় "পেনাং" বা "পিনাং"-এর অর্থ হচ্ছে শুপারী; পূরো নাম—"পুলো পেনাং"; পুলো অর্থে দ্বীপ। আকৃতি অনেকটা শুপারীর মতো বলেই নাকি স্থানটীর ঐ নামকরণ হয়েছে। সংস্কৃতে অনূদিত হ'লে নামটী দাঁড়ায় শুর্পারক-দ্বীপ। পুরাণো নামটী যতই চিত্তাকর্ষক হোক্ না কেন স্থানটীর মোটেই সে-গুণ নেই। প্রথমতঃ হচ্ছে বন্দরে নামার হাঙ্গামা। আমি ছিলাম ফরাসী জাহাজের যাত্রী, তা'ছাড়া ভারতবাসী। তাই পুলিশ এ'সে খুঁটিনাটি করে ছাড়পত্র (Passport) পরীক্ষা করে দেখ্লেন আমি বন্দরে নাম্বার উপযুক্ত কিনা। এইটী নির্দ্ধারণ ক'রতে ক'রতে এক ঘণ্টা সময় কেটে গেল। জাহাজের পিনাংয়ে থাকবার কথা ছিল মাত্র চার ঘণ্টা। এ'র ভিতর বিশেষ কিছু দেখ্বার অবকাশ ছিল না; শুধু রাস্তাগুলি ঘুরে আসা গেল মাত্র।

পিনাংয়ে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাস। চীনেরাই সংখ্যায় বেশী। তা'ছাড়া মালয়, তামিল, ফিরিঙ্গি ও ইংরাজ, সবই কিছু কিছু আছে। জাহাজ থেকে নেমেই 'টুরিষ্ট্'রা দেখ্তে যান পিনাংএর চিড়িয়াখানা, সেটা নাকি খুব দেখ্বার মত জিনিস। বিশেষতঃ ইউরোপ ও মার্কিণ দেশের যাত্রীদের সেটা খুব ভাল লাগে।

ভারত ও ইন্দোচীন

ছোট একটী পাহাড়ের (Crag Hill) উপর কিছুদিন থেকে একটী বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করা হয়েছে, চীনেদের খরচায়। কয়েকজন চীনা ভিক্ষুও সেখানে বাস করেন। স্থানটী খুবই চিত্তাকর্ষক ও মনোরম। মন্দিরের অদূরে একটী জলপ্রপাত সহরের শব্দকে ছাপিয়া উঠেছে। সেখানে একটু বস্‌লে মনে শান্তি পাওয়া যায়। এই শান্তিই হচ্ছে ভারতের নিজস্ব বস্তু। হাজার বছর ধরে সে তা' পূর্ব্ব মহাদেশের নানাস্থানে ছড়িয়েছে। পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসা অবধি সে পুরাণো ধারা দ্রুত বদ্‌লে যাচ্ছে। কিন্তু এই মহাদেশের নানাস্থানে, লৌহবর্ত্ম থেকে দূরে, বহুদূরে, কোনও দুর্গম প্রদেশে, পর্ব্বতের পাদদেশে অথবা মনোহারিণী কল্লোলিনীর তটভূমিতে, অথবা হাজার বছরের সাক্ষ্য দিতে পারে এমন পাদপ-পরিশোভিত নির্জ্জন বনান্তরালে বা গিরিকন্দরে তাপস ও ভিক্ষু ভারতের সে পুরাণো ধারা সযত্নে রক্ষা করছেন। তাঁদের ভরসা—হয়তো আবার এমন দিন ফিরে আস্‌বে যখন প্রাচ্য মহাজাতি তার নূতন সভ্যতার আদর্শকে পদদলিত করে সেই পুরাণো স্মৃতিরেখা বরণ করে নেবে ও জাগিয়ে তুল্‌বে।

পিনাং থেকে সিংগাপুর দু'দিনের পথ। সিংগাপুরে জাহাজ অনেকক্ষণ থাম্‌বে, কথা ছিল। বিকালে পৌঁছে সমস্ত রাতটা আমাদের সেখানে থাক্‌তে হয়েছিল। সিংগাপুর পিনাংএর চেয়ে বড় বন্দর। এখানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের বাস—তার ভিতর দেড় লক্ষই হচ্ছে চীনা। এ অঞ্চলে সিংগাপুর ইংরাজের সব চেয়ে বড় বন্দর ও সেজন্য সেখানে তা'র বহু শক্তির সমাবেশ। এখান থেকে যে নূতন মহাদেশের আরম্ভ তার সঙ্গে ভাবী সংঘর্ষের আশঙ্কাতেই ইংরাজ এ-স্থানকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত করেছে। জাপান ও চীন এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধেই ইংরাজের এই আয়োজন। সিংগাপুরের বল আরও বাড়িয়ে তুল্‌বার জন্য সিংগা-পুরকে অবিলম্বে একটা বড় নৌ-কেন্দ্র (Naval Base) করতে হলে যা কিছু অয়োজনের দরকার ইংরাজ তা' করছে।

যাক্‌, সে-সব ত গেল বর্ত্তমানের কথা। কিন্তু পুরাণো কথাও কিছু না বলে থাকা যায় না। কারণ সিংগাপুরে পৃথিবীর নানা জাতির সমাবেশ আজ নূতন নয়। দু' হাজার বছরের উপর থেকে এই পথ দিয়ে অনেক জাতি বাণিজ্য বা উপনিবেশ সংস্থাপনের

উদ্দেশ্যে সুদূর অজানা দেশের খোঁজে গিয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাঁরা এই জলপথ অতিক্রম ক'রে মালাক্কা উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে দূত পাঠাতে সুরু করেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রোম-সম্রাট মার্কাস্ অরেলিয়স্ এণ্টনিয়াসের (Marcus Aurelius Antonius) প্রেরিত দূত এই পথে চীনদেশে গমন করেন—রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের আশায়। এই হচ্ছে পূর্ব্বদেশে পাশ্চাত্য জগতের প্রথম দূত প্রেরণ। সেই অবধি কত জাতিই না এ পথ দিয়ে গমনাগমন করেছেন। হিন্দুদের পরই পারসিক ও আরব নাবিকেরা এই পথে অনেকদিন ধরে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তার পরই বর্ত্তমান ইউরোপ এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

বর্ত্তমান সিংগাপুর খুব আধুনিক সহর; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে (১৮১৯) ইংরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। সিংগাপুরের পুরাণো নাম সিংহপুর। ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের মজপহিৎ রাজাদের সময়ে যবদ্বীপের ঔপনিবেশিকেরা ইহার স্থাপনা করেন। অনেকে মনে করেন সিংহপুর মালয় কথা,—'সিংগগ্'

অর্থে অবস্থান করা, 'পোরা-পোরা' অর্থে ভাগ করা। যবদ্বীপের ঔপনিবেশিকগণ এই পথে যখন মালাক্কাজয়ে বেরিয়েছিলেন তখন সিংহপুরেই তাঁরা প্রথম অবস্থান করেন ও পরে সেখান থেকে উত্তরাভিমুখে রওনা হন। এ তথ্যের সত্যতা নির্দ্ধারণ একটু কঠিন, তবে সিংহপুর স্থানটী যে আরও প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। বর্ত্তমান সিংগাপুরের ভিতর দিয়ে যে ছোট নদীটি সমুদ্রে পড়েছে তার সম্মুখবর্ত্তী পাহাড়ের উপর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর যে সংস্কৃত লেখা পাওয়া গিয়াছে তাতে জানা যায় যে হিন্দু ঔপনিবেশিকেরা এই পথে অনেক পূর্ব্বেই এসেছিলেন ও স্থানীয় লোকের সঙ্গে একত্রে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। যেস্থানে প্রাচীন লেখাটী আবিষ্কৃত হয় সেটী ধ্বংস ক'রে এখন সরকারের বাংলা উঠেছে। পুরাতত্ত্ববিৎ সে খবর জানেন ; সাধারণে জানে না।

হিন্দুরা এই পথে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই বোধ হয় উপনিবেশ বিস্তার আরম্ভ করেন। মালাক্কা উপদ্বীপে ক্রমশঃ ছোট ছোট হিন্দু রাজত্ব গঠিত ও সংস্থাপিত হয়। এর ভিতর তক্কোল (কক্কোল) বন্দরের নাম আমরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই পাই। এটী ক্রা-যোজকের (Isthmus of Kra) নিকটে

অবস্থিত ছিল। অনুমান হয় প্রথমে হিন্দুরা ঐ পর্য্যন্ত অর্ণবপোতে আস্‌তেন ও তার পর পদব্রজে শ্যাম ও কম্বোজ প্রভৃতি দেশে যেতেন ; পরবর্ত্তী যুগে সমুদ্রো-পকূল দিয়ে আরও দূরে এসে উপনীত হয়েছিলেন। ওয়েলেস্‌লি জেলায় খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রাচীন লেখা পাওয়া গেছে—সংস্কৃত লেখা। মালাক্কা উপদ্বীপে ক্রমে যে-সব হিন্দুরাজ্য গড়ে উঠেছিল তাদের নাম আমরা পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসেও পারি। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন চোল-রাজ রাজেন্দ্র চোলের অর্ণবপোত দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল তখন যে-সব রাজ্য ভারতের অধীনতা স্বীকার করেছিল, তাদের নাম হচ্ছে কটাহ (কড়ার—ক্রা), শ্রীবিজয় (বর্ত্তমান পালেম্‌বাং), পণ্ণই (পণে—সুমাত্রার উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে), মলয়ু (মালাক্কা), মায়িরুড়িঙ্গ্ (মালাক্কা উপদ্বীপের সন্নিহিত), ইলঙ্গশোগম্ (লঙ্কাশুক—মালাক্কা উপদ্বীপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত) তলইতক্কোল (তক্কোল—মালাক্কা উপদ্বীপের পূর্ব্বাংশে), দামলিঙ্গ (তাম্রলিঙ্গ) ও ইলামুরি দেশ (সুমাত্রার উত্তরাংশ)। এই ছোট রাজ্যগুলি মাঝে মাঝে কোন কোন ক্ষমতাশালী প্রতিবেশীর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হ'ত। তার

ভিতর শ্রীবিজয় (সুমাত্রায় পালেম্‌বাং প্রদেশে অবস্থিত ছিল) ও পরবর্ত্তী যুগে যবদ্বীপ খুবই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং এই সব রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয় অবশ্য খুব ক্ষণস্থায়ী ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক সম্বন্ধ বড় একটা না থাক্‌লেও ভারতের ও এই ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যের ভিতর প্রাচীনকালে বেশ একটা আদান প্রদান নিয়মিত ভাবে চল্‌ত। সেই সময়েই আমাদের সিংহপুরের সূচনা।

সিংগাপুর থেকে ইন্দোচীন প্রায় চারদিনের পথ। মালাক্কা উপদ্বীপটা বাঁয়ে রেখে জাহাজ সোজা উত্তরাভিমুখে গিয়ে কোচীন-চীনের বন্দর সাইগণে পৌঁছায়। সাইগণ্‌ মেকং-নদীর মোহনার কাছে অবস্থিত; ইন্দোচীনের খুব বড় বন্দর ও ফরাসী কারবারের একটী প্রধান কেন্দ্র। ইন্দোচীন যে ইংরাজবর্জ্জিত দেশ তা' সাইগণে পৌঁছেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী-ভাষা ছাড়া গতি নেই। মুটে থেকে আরম্ভ করে হোটেলওয়ালা পর্য্যন্ত ফরাসী বল্‌ছে। সাইগণ্‌ সহরটা খুব প্রাচীন নয়। সহরের পুরাণো অংশটা বাইরে পড়ে গেছে। সেখানে শুধু চীনাদের বাস—যেমনি দুর্গম তেমনি অপরিষ্কার। নূতন সহরটা

দেখ্‌লেই মনে হয় এতে ফরাসী জাতির হাত পড়েছে। দু'দিকে রাস্তা—মাঝখানটা ঘাসে ও গাছে সবুজ হয়ে আছে। সেইটী হচ্ছে রাস্তায় বেড়ানর যায়গা। এই রাস্তাগুলিকে ফরাসী ভাষায় বলে 'বুলভার্‌' (Boulevard)। ষ্ট্রীট কিম্বা রোডের এখানে তেমন ছড়াছড়ি নেই। বড় রাস্তাগুলি হয় 'বুলভার্‌', না হয় 'আভেন্যু' (Avenue), গলিগুলিকে সাধারণতঃ বলা হয় 'রু' (Rue)। সাইগণে ভারতবাসীও আছেন—তাঁরা বেশীর ভাগই পন্দিচেরী থেকে সেখানে ব্যবসায় বা কার্য্যোপলক্ষে এসেছেন।

সাইগণে আমাদের তিন চার দিন থাক্‌বার কথা। সেখান থেকে যেতে হবে কম্বোজে—হিন্দু কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে। আচার্য্য সিলভঁ্যা লেভি ও হ্যানয়ের (Hanoi) প্রাচ্য-বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষ, লুই ফিনো (Louis Finot) ও আঁরি পার্মঁতিয়ের (Henri Permentier) সঙ্গে কম্বোজ রওনা হ'বার কথা। সাইগণে দু'তিন দিন থেকে দীর্ঘ সমুদ্র-বাসের ক্লান্তিটা দূর করাই ছিল উদ্দেশ্য। সাইগণে দেখ্‌বার মত যেসব জিনিষ আছে তার মধ্যে যাদুঘর (museum) সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক। কম্বোজের ধ্বংসাবশেষ থেকে

সংগৃহীত মূর্ত্তি বা স্থপতিশিল্পের নিদর্শন কিছু এখানে সংরক্ষিত হয়েছে। সেই সব সংগ্রহ দেখেই প্রথম বুঝ্‌তে পারলাম ফরাসীরা ইন্দোচীনের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে কতটা কাজ করেছেন।

বর্ত্তমান ইন্দোচীনে ফরাসীজাতির প্রতিপত্তি খুব বেশী। কোচীন-চীন ও টঙ্কিন্‌ (Tonkin) দুটী প্রদেশেই তাঁদের উপনিবেশ। তা' ছাড়া কম্বোজ (Cambodia), আনাম (Annam) ও লুয়াং প্রবং (Luang Prabang বা Laos) তাঁদের 'সংরক্ষিত রাজ্য' (Protectorate)। ভারতের করদরাজ্যের চেয়ে এ-রাজ্যগুলির স্বাধীনতা খুব বেশী নয়। তিনটী রাজ্যের ভিতর কম্বোজই সব চেয়ে ক্ষমতাশালী; তারপরই আনাম। আনামীরা এখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যগ্র। সেই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর থেকে রাজনৈতিক দলও সংগঠিত হয়েছে। পারিসে অবস্থানকালে এই দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল।

কোচীন-চীনের অধিবাসীরা হচ্ছে বেশীর ভাগ আনামী, কম্বোজের অধিবাসীরা মালয়। আনামীদের উৎপত্তি চীনা ও তিব্বতী জাতি থেকে (Sino-Tibetan

family); এরা দক্ষিণ চীন ও তিব্বতের প্রত্যন্ত-দেশের আদিম অধিবাসী। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাচীন হিন্দুরাজ্য চম্পা ধ্বংস ক'রে, এরা বর্ত্তমান আনাম রাজ্যে সংস্থাপনা করে। সেই থেকে ঐ প্রদেশে হিন্দুকীর্ত্তি লোপ পায়। কোচীন-চীন ও কম্বোজে যা'রা বাস করে তাদের অধিকাংশই মালয় জাতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এরা গঙ্গানদীর উপত্যকা থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় দ্রাবিড় ও আর্য্য জাতির আগমনে ও আক্রমণে এরা মালাক্কা উপদ্বীপ থেকে ইন্দোচীন পর্য্যন্ত যে ভূমিভাগ, তার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। নৃতত্ত্ব-বিৎগণ এই প্রাচীন মহাজাতির নামকরণ করেছেন অষ্ট্রো-এসিয়াটিক্ (Austro-Asiatic) কম্বোজের অধিবাসী ক্ষ্মের জাতি (Khmer) এই মহাজাতির একটি শাখামাত্র। অবশ্য অন্য জাতির সঙ্গে এদের সংমিশ্রণ ঘটেছে ও ভারতীয় হিন্দু ঔপনিবেশিকদের থেকে এরা ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছে।

২

কম্বোজের পথে

সাইগণ্ থেকে কম্বোজে যাওয়া নদীপথেই প্রশস্ত। অবশ্য খানিকটা পথ রেলে যাওয়া চলে, কিন্তু তারপর আবার ষ্টীমারেই উঠ্তে হয়। একদিন ভোরে আমরা সাইগণ্ থেকে বেরিয়ে পড়লাম—ষ্টীমারে বরাবর কম্বোজ পর্য্যন্ত যেতে হবে। তিন দিনের পথ। মে-কং নদী বেয়ে যেতে হয়। অনেকে মনে করেন 'মে-কং —'মাতা-গঙ্গা'রই অপভ্রংশ। হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ মাতৃ-ভূমির স্মৃতি জাগিয়ে রাখ্বার জন্য নূতন দেশের নদ-নদীর এই সব নূতন নামকরণ করেছিলেন।

কোচীন-চীন ও কম্বোজ নদীমাতৃক বঙ্গদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। কানায় কানায় ভরা নদীগুলি তাদের শাখা উপশাখা ছড়িয়ে প্রদেশটাকে এমন সবুজ ও সজীব

ক'রে রেখেছে যে, দেখ্‌লে চোখ তৃপ্ত হয়,—প্রবাসী বাঙ্গালীর মন আনন্দে উচ্ছ্বল হয়ে উঠে। নদীর তটভূমি পর্য্যন্ত জল ছাপিয়ে উঠেছে ; দু'ধারে ধানের ক্ষেত হাওয়ায় নুয়ে পড়ছে ; অদূরে ছোট ছোট গ্রামগুলি চালাঘর নিয়ে নারিকেলবনের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে। অধিবাসীরা প্রধানতঃ নৌকায় চলাফেরা করে, কারণ প্রায়ই জোয়ারের জলে তাদের গ্রামপথগুলি খালে পরিণত হয়। অনেকেই মৎস্যজীবী। তাদের চেহারার সঙ্গে বাংলার মৎস্যজীবীদের এমন সাদৃশ্য আছে যে, দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়। মনে হয় যেন উভয়ে এক মহা জাতির উপশাখা। অবশ্য আমাদের দেশের 'মালো'-রা যে মালয় মহাজাতিরই একটী শাখা তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। বহু প্রাচীনকাল থেকে এরাই বাংলার সুদক্ষ নাবিক।

সোণার বাংলার "স্মৃতি-জাগানিয়া" এই নদীপথ দিয়ে দু'দিন চল্‌বার পর আমরা প্নোম্‌-পেনে (Pnom-penh) উপস্থিত হলাম। প্নোম্‌-পেন্‌ বর্ত্তমান কম্বোজের রাজধানী, প্রাচ্য জগতের নানাজাতির বাসস্থান। এখানে ফরাসীদেরও একটা ছোটখাটো উপনিবেশ আছে। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভির এক ছাত্র

এই সহরে থাকেন। ইনি ইন্দোচীনের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁর নাম —জর্জ্জ গ্রোলিয়ে (Georges Groslier)। এঁর গৃহেই আমরা সেদিনকার মত অতিথি হ'লাম। এঁর কাজ দেখেও আমাদের খুব শ্রদ্ধা হ'ল। ইনি প্নোম্-পেনে একটী আদর্শ মিউজিয়ম গড়ে তুলেছেন। কম্বোজের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহই এখানে সংগ্রহ 'করে রাখা হয়েছে। সেই সব আদর্শ নিয়ে নূতন শিল্পীদের কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, যাতে পুরাণো শিল্পের আবার নূতন ক'রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে পারে।

প্নোম্-পেন্ সম্ভবতঃ খুব প্রাচীনকাল থেকেই কম্বোজের একটা সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। "প্নোম্" কথার অর্থ 'উচ্চ ভূমিভাগ' বা 'পাহাড়'। প্নোম্-পেনের যে অংশে ফরাসীদের বাস সেটী পাহাড়ের মতই উঁচু। কম্বোজের প্রাচীন ইতিহাসের কথা যখন উঠ্‌বে তখন প্নোম্-পেনের কথাও পুনরায় তুল্‌বো। বর্ত্তমান কালে কম্বোজের রাজপুরী প্নোম্-পেনেই অবস্থিত। সেট প্রদক্ষিণক'রে নেওয়া গেল—কারণ প্রদক্ষিণ ছাড়া আর বেশী কিছু দেখবার উপায় ছিল না। সময় সংক্ষেপ। অধ্যাপক লুই ফিনোর (Louis Finot) চেষ্টায় এখানে

একটী পালি বিদ্যাপীঠ (Ecole de Pali) স্থাপিত হয়েছে। প্রায় শতাধিক ছাত্র এখানে প'ড়ছে। পালিই হচ্ছে বর্ত্তমান কম্বোজের দেবভাষা। কারণ কম্বোজের অধিবাসীরা কয়েক শতাব্দী থেকে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছে। এখানে দেখ্‌বার মত একটী বৌদ্ধ-মন্দিরও আছে। মন্দিরটীর গঠন একটু নূতন রকমের। কম্বোজের হিন্দু ভাস্করদের প্রভাব এতে পরিলক্ষিত হয়। তা'ছাড়া সবটা পাগোদার (Pagoda) আকারে একটা উঁচু স্থানে নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এর পাশেই একটী ভিক্ষুসংঘের আবাস।

প্নোম্-পেন্ এমনি করে দেখে নিয়ে সেইদিন রাত্রেই আমরা এঙ্কোর রওনা হ'লাম। এঙ্কোর (Angkor —'নগর' কথার রূপান্তর) কম্বোজের প্রাচীন রাজধানী। এখানেই কম্বোজের প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের ধ্বংসাবশেষ—যা দেখ্‌বার জন্য দেশবিদেশ থেকে মানুষ আসে। প্নোম্-পেন্ থেকে রওনা হ'য়ে পরদিন সকালে আমরা একটা বড় হ্রদে এসে প'ড়লাম্। এই হ্রদটীর নাম তোন্‌লে সাপ্ (Tonle Sap)। এইখানে মে-কংএর উপধারা এসে প'ড়েছে। অন্যান্য শাখানদীও এখানে জল বহন ক'রে নিয়ে এসেছে।

কম্বোজ—এঙ্কোর ভাট (পৃঃ ২৩)
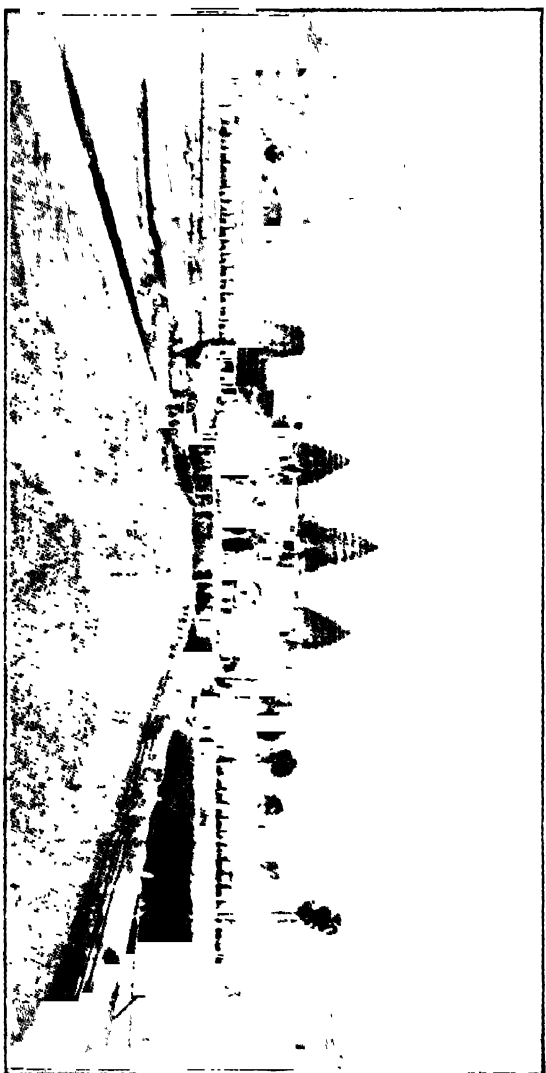
হ্রদ অতিক্রম ক'রে সিয়েম্ রীপ্ (Siem Reap) নামক ছোট্ট পল্লী। এখান থেকে এঙ্কোর যেতে মোটরে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। এঙ্কোরের সব চেয়ে বড় মন্দির এঙ্কোর-ভাটের (Angkor Vat) সাম্‌নেই একটী ফরাসী ভদ্রলোকের হোটেল বা বাংলা। এইখানেই এঙ্কোরের যাত্রীরা ওঠেন। এঙ্কোর এখন ধ্বংসে পরিণত। দুর্ভেদ্য বনরাজির ভিতর পুরাণো রাজধানীর রাজপথ ফরাসী পণ্ডিতেরা খুঁজে বের ক'রেছেন ও পরিষ্কার ক'রে সুগম ক'রে দিয়েছেন। মন্দিরের ভিতরকার আগাছা নষ্ট ক'রে মন্দিরগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখ থেকে তাঁরা রক্ষা ক'রেছেন। স্তূপাকার ধ্বংসের মাঝ থেকে এঙ্কোর-ভাট্‌কে বাঁচান হয়েছে। এটী হচ্ছে বিষ্ণুর মন্দির। তা'ছাড়া পুরাণো রাজপ্রাসাদ—এঙ্কোর টোম্‌কে (Angkor Thom) বন পরিষ্কার ক'রে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাচীন ভাস্কর্য্যের যেটুকু সন্ধান মেলে তা' মিউজিয়মে সংরক্ষিত হয়েছে। বস্তুতঃ ফরাসী পণ্ডিতেরা ভারতের ও কম্বোজের এই লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ যে কাজ ক'রছেন—তা' বিশেষরূপে প্রশংসনীয়।

বর্ত্তমান কম্বোজের কথা বিশেষভাবে বলা শক্ত। তবে যা' দেখেছি তা'তে আমার মনে হয়েছে—প্রাচ্যজগতের অন্যান্য দেশ (চীন, আনাম, শ্যাম ইত্যাদি) পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়ায় যেমন ওলট্-পালট্ হচ্ছে ও নূতন আদর্শ গ্রহণ করার জন্য ছুটে চলেছে—কম্বোজের এখনো সে অবস্থা আসেনি। এটা ভাল কি মন্দ তা' জানি না। তবে এর ফলে কম্বোজের ভবিষ্যৎ উন্নতি হয়ত অনেকটা সুদূরপরাহত হয়ে দাঁড়াবে। ইউরোপের যেখানেই গিয়েছি চীনের, শ্যামদেশের ও আনামের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু কম্বোজীয় একটীও দেখিনি। ইউরোপ থেকে যেটুকু গ্রহণ করা দরকার তা' নিতেও কম্বোজীয়দের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না।

সিয়েম্ রীপ্ থেকে আমরা যে দিন এঙ্কোরে পৌঁছুলাম্ সে দিনটা বিশ্রাম ক'রতেই কেটে গেল। তিনদিন ধরে ষ্টীমারে থেকে আমরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম—ঘুরে বেড়াবার আর সামর্থ্য ছিল না। এঙ্কোরে আমাদের মোট ছ' দিন থাকবার কথা। ঐ

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এঙ্কোরের স্তূপাকার ধ্বংসটা দেখে নিতে হ'বে। অবশ্য তন্ন তন্ন ক'রে দেখ্‌তে গেলে অনেক সময়ের দরকার। ততটা অবসর আমাদের ছিল না।

এঙ্কোরে আমাদের পথপ্রদর্শক হ'লেন আঁরি মার্শাল (Henri Marchal)। হ্যানয়ের প্রাচ্য বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে এঙ্কোরের প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণের ভার নিয়ে ইনি এখানে আছেন ও কয়েক বৎসর ধরে অনেক কাজ করেছেন। ভাস্কর্য্যের অনেক লুপ্ত গৌরব এখান থেকে উদ্ধার ও ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলিকে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বার মত ব্যবস্থা ইনিই ক'রেছেন। খুব অমায়িক লোক, বেশ দিল-খুস্‌—যেমন সত্যকার ফরাসীরা হ'য়ে থাকেন। এঙ্কোরে আমরা যে ছ'দিন ছিলাম তা'র ভিতর তিন দিনই এঁর বাড়ীতে ভূরিভোজন হ'য়েছিল।

আমাদের হোটেলটা ঠিক এঙ্কোর-ভাটের সামনেই ছিল। সেখান থেকে এঙ্কোর-ভাটের গগনস্পর্শী মন্দির-চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। মন্দিরের সাম্‌নেটা বেশ চোখে পড়ে। চারিদিকে নারিকেল ও গুবাকের বন

মন্দিরটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তা'রাই তা'র চিরন্তন সাথী। সাত্‌শো' বছরের উপর এখানে জনমানবের বিশেষ কোলাহল শোনা যায়নি। শ্যামের (Siam) সামরিক অভিযান এখান দিয়ে অনেকবার গিয়েছে। এই বিরাট মন্দির দেখে যে তা'দের মনে কোন ভাবের সঞ্চার হয়েছিল তা'র কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ ফরাসীদের অধিকারের পূর্ব্বে এঙ্কোর অনেক দিন ধ'রে শ্যামরাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল; কিন্তু তা'র ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলির কোন সংস্কার করবার চেষ্টা হয়নি। লোকের বসবাস এখান থেকে একপ্রকার উঠে গিয়েছে। এঙ্কোর ভাটের পাশেই কিছুদিন হ'তে একটী বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ভিক্ষু বাস করেন। তাঁ'রাই সকাল-সন্ধ্যায় এঙ্কোরের এই বিশাল ধ্বংসরাশির নিস্তব্ধতা দূর করবার বৃথা প্রয়াস করে থাকেন। কিন্তু যে-নগর এক দিন সহস্র সহস্র নাগরিকের কলরবে মুখরিত হ'তো তা'র এই সাত্‌শো' বছরের নিস্তব্ধতা আর ভাঙ্গবার নয়। দশজন ভিক্ষুর মুখনিঃসৃত বুদ্ধবাণী এঙ্কোরের দুর্ভেদ্য বনরাজির মধ্যে কোথায় মিলিয়ে যায় কেউ জানে না। পুরাণো রাজপ্রাসাদের প্রাচীর

পর্য্যন্তও তা পৌঁছায় না। সমস্ত ধ্বংসাবশেষ যেন এক অভিশপ্তপুরীর নিদর্শনের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এইখানে কম্বোজের প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের কথা কিছু বলা আবশ্যক। হিন্দু ঔপনিবেশিকেরা এ-দিকে কোন্ সময়ে এসেছিলেন তা' ঠিক জানা গেলে অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে বলা চলে যে, খৃষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভেই হিন্দুরা মে-কং এর ধারা বেয়ে কম্বোজ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছান। চীনেদের ইতিহাসে বলা হয়েছে যে ঐ সময় কৌণ্ডিণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ কম্বোজে হিন্দুরাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করেন। 'কম্বোজ' নামের তখনও উৎপত্তি হয়নি। প্রথমে সে-রাজ্যের নাম ছিল 'ফু-নান্। ফু-নান্ হচ্ছে "ভোনম্" বা প্নোম্" কথার কথার চীনা রূপান্তর। কম্বোজের বর্ত্তমান রাজধানী প্নোম্-পেনের প্রসঙ্গেই আমরা বলেছি যে 'প্নোম্' কথার অর্থ হচ্ছে—"উঁচু স্থান"। 'ফু-নানে'র প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল তা' অনুমান করবার উপায় নেই। তবে মে-কং-এর উপত্যকাতেই যে এই প্রাচীন উপনিবেশের সংস্থাপনা হয়েছিল তা'তে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রথম উপনিবেশস্থানের কয়েক শতাব্দী পরেই আর এক দল হিন্দু ঔপনিবেশিক কম্বোজ (বা কম্বুজ)

রাজ্যের সৃষ্টি করেন। কম্বোজ প্রথমে 'ফু-নানে'র আধিপত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। তারপর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-শতাব্দীর শেষভাগে কম্বোজের রাজা চিত্রসেন মহেন্দ্রবর্ম্মণ 'ফু-নান্' জয় ক'রে কম্বোজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। মহেন্দ্রবর্ম্মণের শাসনকালের যে সংস্কৃত লেখা পাওয়া গিয়েছে (৬০৪ খঃ অঃ) সেইটীই হচ্ছে কম্বোজের সব চেয়ে প্রাচীন লেখা। এই সময় থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুরাজারা অব্যাহত ভাবে কম্বোজ শাসন করেন। এই সাত্শো' বছরের ইতিহাসই হচ্ছে কম্বোজের গৌরবের যুগ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই থাই (Thai) দিগের আক্রমণে কম্বোজের হিন্দুরাজত্বের অবসান হয়। সেই থেকে বর্ত্তমান কম্বোজের সৃষ্টি। থাই (Thai) রাজারাই সেই সময় থেকে তাঁদের উপনিবেশ বিস্তার করেন। 'থাই'দের উৎপত্তি হচ্ছে —তিব্বতী ও চীনেদের থেকে। এরা অনেক দিন ধ'রে দক্ষিণ চীনে ও ইন্দোচীনের উত্তর দিকের প্রত্যন্তদেশে বাস ক'রতে থাকে। তারপর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেই নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়েই এদের বিভিন্ন শাখা কম্বোজ, শ্যাম ও আনাম প্রভৃতি

দেশ জয় ক'রে নূতন রাজ্য স্থাপনা করে। এই সময় থেকে ঐ সব দেশের প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংস সুরু হয়। কারণ থাইরা (Thai) তখনও তা'দের অসভ্য অবস্থা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। হিন্দু ঔপনিবেশিক বা হিন্দু সভ্যতায় দীক্ষিত কম্বোজীয় ও মালয়দের থেকে তা'রা সভ্যতার সমস্ত উপাদান গ্রহণ ক'রলেও তাদের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যথাযথ মূল্য বুঝতে পারা এই বর্ব্বর বিজেতাদের পক্ষে শক্ত ছিল। সুতরাং এই পুরাতন কীর্ত্তির যথাযোগ্য সম্মান তা'রা কোন দিনই করেনি। প্রাচীন কম্বোজের রাজধানী অনেকবার স্থানান্তরিত হয়েছিল। সেই সব রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ উত্তর কম্বোজের নানাস্থানে দেখা যায়। এ ছাড়া বহু প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের নিদর্শনও পাওয়া যায়। সমস্ত ভগ্নাবশেষের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—কম্পোং চ্যাম্ (Kompong Cham), খাস মে-কংএর তীরে অবস্থিত ; বাটি (Bati) ও প্নোম্ চিসর (Pnam Chisor)—বর্ত্তমান কম্বোজের টা-কিও (Ta-keo) প্রদেশে অবস্থিত। এ ছাড়া কম্পোং-টোম্ (Kompong-Thom) প্রা-খান্ (Prah-khan) ও বেং

মেলিয়া (Beng Mealea)। কম্পোং-টোমের বাইরের প্রাচীর প্রায় দু'মাইল বিস্তৃত। এ-সব ধ্বংসাবশেষ উত্তর কম্বোজে—বিশাল হ্রদের (Tonle-Sap) নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই দেখা যায়। এর ভিতর যেগুলি সব চেয়ে বড় তা' দেখ্‌বার এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি। ধ্বংসাবশেষের চারিদিকে এমন দুর্গম বন উঠেছে যে সেগুলিকে সুগম করতে অনেক পরিশ্রম ও সময়ের দরকার।

কম্বোজের প্রাচীন কীর্ত্তির ভিতর সব চেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে এঙ্কোর। সেখানেই এ পর্য্যন্ত বেশী কাজ হয়েছে এবং তা'র পথঘাটগুলি সুগম করা হয়েছে। কম্বোজের পুরাতন কীর্ত্তি যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের সব চেয়ে প্রধান আকর্ষণ হ'ল—এঙ্কোর-ভাট্। শুধু কম্বোজ কেন, সমস্ত হিন্দু জগত খুঁজ্‌লেও তার তুলনা মিলবে না। কম্বোজের সমস্ত দুঃখ ধ্বংসের ভিতরও এই এঙ্কোর-ভাট্ এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং সেইটী ভাল ক'রে দেখলে প্রাচীন কম্বোজের কীর্ত্তির ধারণা হয়।

কম্বোজ—এঙ্কোর টোমের ধ্বংসাবশেষ

(পৃঃ ৩১)

এঙ্কোর কোন্ সময়ে রাজধানীতে পরিণত হয় তা' ঠিক জানা যায় না। তবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমেই (৮০২ খৃঃ অঃ) কম্বোজের রাজা জয়বর্ম্মণ বর্ত্তমান এঙ্কোরের অনতিদূরে প্রা-খান (Prah-khan) নামক স্থানে তাঁর রাজপুরী নির্ম্মাণ ও বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর অধস্তন চার পুরুষ পরে, রাজা যশোবর্ম্মণের (৮৮৯ খৃঃ অঃ) সময়, এঙ্কোরে রাজধানী স্থাপিত হয়। এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে বর্ত্তমান এঙ্কোর-টোম্ (Angkor-Thom)। এই নূতন রাজধানীর নামকরণ হয় যশোধরপুর। যশোধর-পুরই এঙ্কোরের প্রথম সূচনা।

এই অভিশপ্ত যশোধরপুরের ধ্বংসের অবস্থাই হচ্ছে সব চেয়ে শোচনীয়। একদিন রাজপুরী ছিল ব'লে অনেক ঝড় এর বুকের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। বিজেতার আক্রোশ এই রাজপুরীর উপর বহুবার পড়েছিল। লুঠ্তরাজের ত কথাই ছিল না। হাতীর সাহায্যে প্রাসাদের স্তম্ভশিখর ও চারুশিল্পকার্য্য বিজেতারা যে ইচ্ছা ক'রে নষ্ট ক'রেছিল তা'র যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ'ছাড়া সাতশো' বছর ধ'রে এর ভিতর দস্যুর গুপ্তধনের তল্লাস তো আছেই। গত

শতাব্দীতে যখন শ্যামের সঙ্গে কম্বোজের যুদ্ধ হয়, তখন শ্যামদেশের অভিযানের প্রধান কেন্দ্র এখানেই স্থাপিত হয়, কারণ এমন সুরক্ষিত স্থান আর পাওয়া যায়নি।

এই যশোধরপুরের (Angkor-Thom) নগর-প্রাকারের চারিধার দিয়ে একটী সুপ্রশস্ত খাত্ গিয়েছে।
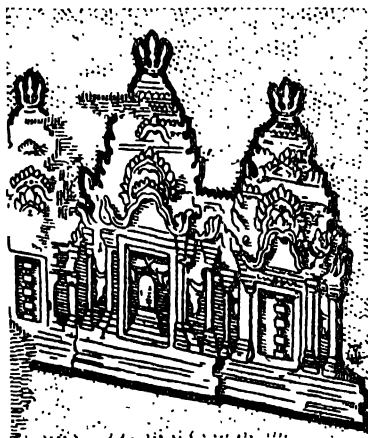
বায়ন মন্দির
প্রাচীরে খোদিত শিবমন্দিরের চিত্র।

এখন তা'র অনেক স্থানে ভরাট হয়েছে, কিন্তু পূর্ব্বে এই খাত প্রায় বারো হাতেরও বেশী গভীর ছিল। এই

খাত পার হ'তে হ'ত সেতুর উপর দিয়ে। সেতুর দু'ধারের বেদিকা (Railing) পরিশোভিত হ'য়েছিল সাগরমন্থনের চিত্র দিয়ে। নাগরাজকে অবলম্বন ক'রে বিশালকায় দেবাসুরগণের মূর্ত্তি দু'দিকে গড়ে তোলা হ'য়েছিল। এই সব মূর্ত্তির অনেকগুলিই এখন ধ্বংস পেয়েছে ও দেবতাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে। নাগরাজের লেজ খ'সে গিয়েছে—ফণা বিগতশ্রী হয়েছে। সংস্কারের অভাবে সেতু ধ্বংসোম্মুখ।

এই সেতু পার হ'য়ে আমরা নগরপ্রাচীরের তোরণে একদিন সকাল বেলা এসে অবাক হয়ে দাঁড়ালাম। বিশাল প্রাকার—প্রায় ৯ মাইল ধ'রে চতুষ্কোণ যশোধরপুরকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে। পাঁচটী দরজা দিয়ে এই নগরে প্রবেশ করা যেত। পূর্ব্বদিকের দুইটী দরজা —প্রায় পাশাপশি।

একটী সিংহদ্বার বরাবর রাজপ্রাসাদের সামনের চত্বরে পৌঁছুবার জন্য, অন্যটী নগরের ঠিক মধ্যবর্ত্তী দেবমন্দির বায়নে (Bayon) পৌঁছুবার জন্য। এ ছাড়া অন্য তিন দিকে সমান্তরালভাবে তিনটী দ্বার আছে; তার কোনটীই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি। আংশিকভাবে নষ্ট হ'লেও তা'কে সংস্কার ক'রে কোনমতে দাঁড় করিয়ে

রাখা হয়েছে। পাঁচটী দরজাই এক মাপে নির্ম্মিত হয়েছিল। দরজার উভয় পার্শ্বে যে শান্ত্রীদের ঘর ছিল তা দেখ্‌লে স্পষ্ট বোঝা যায়। দরজার উপরটা দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। পাথরে খোদিত বিশাল চতুর্ম্মুখ-মূর্ত্তি। তার উপর তোরণের চূড়া তোলা হয়েছে। এ মূর্ত্তি দেব-পিতামহ ব্রহ্মার বলেই মনে করা হয়। কিন্তু পিতামহের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটেছে। যে নগরতোরণের তিনি শোভাবর্দ্ধন করতেন সেখান দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী আর কোন শোভাযাত্রা যায়নি। যে-নগরের চারদিকে তাকিয়ে তিনি নাগরিকগণের শুভকামনা করতেন ও তাদের ইষ্টলাভের সহায় হতেন, সে নগরের রাজপুরী বিজাতীয় শত্রুর আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। বায়নের মন্দিরচূড়া মাটীর উপর লুটিয়ে প'ড়েছে অনেক শতাব্দী ধ'রে সেখানে আর মঙ্গল-ঘণ্টা বাজেনি। চতুর্ম্মুখের চারিটি মুখও হতশ্রী হয়েছে। মাথার মুকুট প্রাচীর-দ্বারে প'ড়ে বর্ব্বর বিজেতার পদতলে চূরমার হয়ে গিয়েছে। তাই লতাগুল্ম এসে সে মুখকে ঢেকে ফেলেছে, দু'পাশ থেকে গাছ এসে তা'র ডালপালা নিয়ে সে-মুখকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে—লোকলজ্জা থেকে সে-মুখকে অন্তরাল ক'রে রাখবে বলে।

এঙ্কোরের ধ্বংসাবশেষ

দক্ষিণের দ্বার দিয়ে আমরা বিগতশ্রী যশোধরপুরে প্রবেশ ক'রলাম। নগরের পুরাণো রাজপথকেই আবার সংস্কার ক'রে নূতন ক'রে তোলা হ'য়েছে। তা'র দু'ধারে নূতন গাছ দিয়ে রাজপথের শোভা ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা করা হ'য়েছে। প্রকৃতির স্নিগ্ধতা তা'কে ঘিরে র'য়েছে বটে, কিন্তু রাজার ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে এনে কে আর তা'কে দেবে? শোভাযাত্রার সঙ্গীতে যে-রাজপথ ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌তো, কালের অট্টহাসির স্রোত সে-পথের ওপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছে,—শোভাযাত্রা সে-পথ দিয়ে আর যায়নি—শোভাও ত'ার আর কেউ ফিরিয়ে আন্‌তে পারেনি। এই

শোভাহীন পথ বেয়ে চ'লেছি। যে-দিকে তাকাই ইষ্টক-চুর্ণ ও প্রস্তর-খণ্ড পুঞ্জীভূত হ'য়ে র'য়েছে। প্রাচীন গৃহভিত্তি ধূলিসাৎ হ'য়েছে। গৃহপ্রাঙ্গণ বনে পরিণত হ'য়েছে। সুনিপুণ ভাস্কর্য্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে র'য়েছে। সাতশো বছর ধ'রে সে-গুলির উপর কেউ দৃকপাতও করেনি। যে যশোগরিমা ঐ প্রস্তর-স্তুপের নীচে চাপা প'ড়েছে, তা'র জন্য এই সুদীর্ঘ-কাল ধ'রে কারো প্রাণ কেঁদে ওঠেনি।

এই পথ বেয়ে আমরা বায়ন (Bayon) মন্দির প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হ'লাম। নগরের ঠিক কেন্দ্র-স্থানে বায়ন নির্ম্মিত হ'য়েছিল। চারিদিক থেকে চারিটী সুপ্রশস্ত রাজপথ বায়নের এই প্রাঙ্গণে এসে মিশেছে। এই প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে একটু উত্তর দিকেই রাজ-প্রাসাদের বিশাল ধ্বংসাবশেষ। কম্বোজের আর কোনো মন্দির বায়নের মত এমন ভীষণ-ভাবে ধ্বংসে পরিণত হয়নি। মন্দিরের চূড়াগুলি মাটিতে প'ড়ে গিয়েছে—তার প্রতি অংশ স্থানচ্যুত হ'য়েছে। চতুর্দ্দিকের প্রাচীর ভেঙে প'ড়েছে। স্তম্ভগুলির প্রায় সবই ভগ্নাবশেষে পরিণত। অনুমান হয় যে সে-গুলিকে বর্ব্বর বিজেতারা হস্তীর সাহায্যে নষ্ট ক'রেছে। নইলে

এই সুদৃঢ় স্তম্ভগুলির ধূলিসাৎ হবার অন্য কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কম্বোজের কোনো কোনো মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে খোদিত চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, অনেক সময় এমনি ভাবে নগর ধ্বংসের কাজে হস্তী নিযুক্ত করা হ'ত। বায়নের বাইরের দিকটা
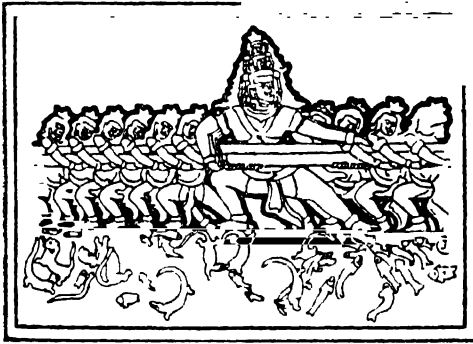
বায়ন মন্দির
প্রাচীরে খোদিত সমুদ্রমন্থনের চিত্র।

সম্পুর্ণ নষ্ট হ'য়ে গেলেও মন্দিরের ভিতরকার অংশ এখনও অনেকটা দাঁড়িয়ে আছে। তা'তে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সব দিক্‌টা দেখলে মনে হয় যে, বায়ন নির্ম্মাণেই কম্বোজেব স্থপতিদের নৈপুণ্যের চরম পরিণতি। বায়ন পিরামিডের

(Pyramid) মত তিনটী স্তরে নির্ম্মিত। সর্ব্বোচ্চ স্তরের উপর মুকুটের মতো ক'রে মন্দিরের উচ্চ চূড়া স্থাপিত। ব্রহ্মার চতুর্মুখ দিয়ে তোরণ-চূড়ার শোভা বৃদ্ধি করা হ'য়েছিল। প্রতি তোরণে অদ্ভূত কারু-নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়।

যশোধরপুরের মন্দিরগুলির ভিতর বায়ন যে সব চেয়ে প্রাচীন তা'তে কোন সন্দেহ নাই। এর নির্ম্মাণের ধারা দেখে অনুমান হয় যে যশোবর্ম্মণের পিতা ইন্দ্র-বর্ম্মণের রাজত্বকালে (৮৭৭-৮৮৯ খৃঃ অঃ) বায়নের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় ও যশোবর্ম্মণের সিংহাসন-আরোহণের পর (৮৯০ খৃঃ অঃ) এই মন্দিরের কার্য্য শেষ হয়। এর কয়েক বৎসর পর (৯২০ খৃঃ অঃ) যশোবর্ম্মণ এই নূতন রাজ-ধানীতে বসবাস আরম্ভ করেন। বায়নেও সেই সময় দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়।

বায়নে কোনো প্রাচীন লেখা পাওয়া যায়নি। কোন্ দেবতার এখানে প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল তা'ও ঠিক বোঝা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে, এটী শিব-মন্দির ছিল ও রাজা ইন্দ্রবর্ম্মণ ও যশোবর্ম্মণ শৈব ছিলেন। বায়নের প্রস্তর-প্রাচীরে খোদিত-চিত্রে হিন্দুধর্ম্মের পুরাণ কথা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। এই খোদিতচিত্রে শিব মন্দিরের

চিত্র পাওয়া গিয়েছে বলে মনে হয় বায়ন শিব মন্দির ছিল। চিত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ও অন্যান্য দেব দেবীর কীর্ত্তি কলাপ অঙ্কিত হ'য়েছে। অপ্সরীদের নৃত্য, দেব-সেনাপতি স্কন্দের অভিযান, সাগরমন্থন প্রভৃতি আখ্যানও চিত্রিত হ'য়েছে। এ-ছাড়া যশোধরপুরের নাগরিকদের সাধারণ কার্য্যকলাপের পরিচয়ও এই খোদিত পাষাণের ভিতর পাওয়া যায়। বায়নের প্রস্তর-প্রাচীরগাত্রে, কম্বোজের শিল্পীদের লেখনীতে, হিন্দুধর্ম্মের এই পুরাণ-কথা এমনি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হ'য়েছে, যে তা'দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়।

বায়নের ধ্বংসাবশেষকে খাড়া রাখ্‌বার জন্য ফরাসী পণ্ডিতেরা খুব খেটেছেন। হ্যানয়ের (Hanoi) প্রাচ্য-বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষরা যখন এঙ্কোরের প্রাচীন স্মৃতি-সংরক্ষণের ভার নিজেদের হাতে নেন তখন বায়নের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। বায়নের ধ্বংসাবশেষকে দুর্ভেদ্য বনে ঘিরে ধ'রেছিল; তা'র প্রাচীর ভেদ ক'রে অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছিল; ভগ্ন মন্দির-চূড়া লতাগুল্মে আবৃত হ'য়ে প'ড়েছিল ও মন্দিরের ভাস্কর্য্য দিনের পর দিন নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিল। গত বিশ বৎসরের কার্য্যে বায়নের যা' অবশিষ্ট ছিল তা এখন নিরাপদ হ'য়েছে,

তা'র প্রাঙ্গণ সুগম হ'য়েছে, তা'র ভাস্কর্য্য মিউজিয়মে সুরক্ষিত হ'য়েছে।

কিন্তু সে ভগ্ন-মন্দিরের নিস্তব্ধতা আর ভাঙ্গেনি। সে মন্দির-দ্বারে পূজার ঘণ্টা আর কেউ বাজায় নি,
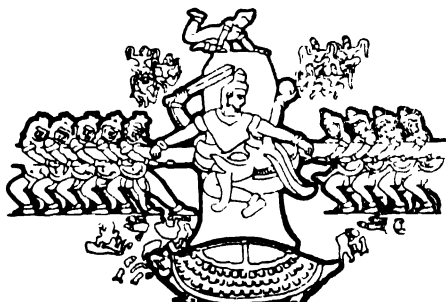
বায়ন মন্দির

প্রাচীরে খোদিত সমুদ্রমন্থনের চিত্র।

আরতি দেবার লোক আর মেলেনি। হাজার বছর আগে যেমনি ক'রে তার প্রাঙ্গণ ভক্তের কলরবে মুখরিত হ'ত তেমনি ক'রে দেবতার পূজা করবার জন্য আর ভক্তের সমাগম হয়নি। সে মন্দিরে দেব-তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার বাসনা নিয়ে সে-পথ দিয়ে

আর কোনো পথিক এই সাতশো বছর ধ'রে আসেনি।

* * *

বায়ন থেকে সোজা পথ বেয়ে উত্তরে গেলেই পুরাণো রাজপ্রাসাদের চত্বরে এসে পৌছান যায়। প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখবার আগে আর একটি মন্দির দেখে যাওয়াই সমীচীন, কারণ সেটী পথে পড়ে। এটী বায়নের উত্তর-পশ্চিমে বনের ভিতর অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের পাশে এটি নির্ম্মিত হ'য়েছিল —রাজা ও তাঁ'র অন্তঃপুরবাসিনীদের দৈনন্দিন পূজার সুবিধার জন্য। এই মন্দিরে যা'বার পুরাণো পথ ভগ্ন-প্রাচীরের প্রস্তরের নীচে চাপা প'ড়েছে। তাই কোন সোজা পথ দিয়ে এ'তে পৌঁছান যায় না। মন্দিরটীর পুরাণো নাম লোপ পেয়েছে। বর্ত্তমানে একে বাফুয়ন (Baphuon) বলা হয়। এই নামও কোনো প্রাচীন নামেরই রূপান্তর।

দুর্গম বনপথ দিয়ে আমরা এই মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হ'লাম। যশোধর-পুরের মন্দিরগুলির ভিতর বায়নের পরেই এর স্থান। অনুমান করা হয় যে, রাজা জয়-বর্ম্মণের রাজত্বকালে (৯৬৮ খৃঃ অঃ) এই মন্দির নির্ম্মিত

হয়। বনানীর অত্যাচারে বাফুয়ন প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'য়েছে। এর যে-টুকু অবশিষ্ট, সে-টুকু রক্ষার জন্য কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি। বাফুয়নের প্রাচীর-গাত্রে যে-সব চিত্র খোদিত হ'য়েছে, সে-গুলি প্রায়ই রামায়ণ থেকে নেওয়া। এর কারু-নৈপুণ্য বায়নের মতো সুন্দর না হ'লেও প্রসংশনীয়।

বাফুয়ন থেকে বেরিয়ে রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের পাশ দিয়ে বনপথ বেয়ে আমরা রাজপথে এসে প'ড়্লাম। বায়ন থেকে এই পথটী রাজপ্রাসাদের চত্বর পর্য্যন্ত পৌঁছেছে। এই পথ ধ'রে আমরা রাজপ্রাসাদের বিশাল ধ্বংসাবশেষের সাম্নে এসে দাঁড়ালাম। রাজপ্রাসাদকে ফিমিয়েনক(স্) (Phimeanakas) বলা হয়। প্রাচীন নাম ছিল "বিমানোকস্" অর্থাৎ "স্বর্গপুরী"। ফিমিয়েনক্ পুরাণো সংস্কৃত কথাটিরই কম্বোজীয় রূপান্তর। এই "বিমানোকস্" প্রাসাদ প্রাচীরে সুরক্ষিত ও নানা ভাগে বিভক্ত। ভিতরের দিকে ছিল অন্তঃপুর—সেখান থেকে বাফুয়নের মন্দিরে সহজেই যাওয়া চ'ল্ত। অন্তঃপুরের অংশটা এমনিভাবে ধূলিসাৎ হ'য়েছে ও তা'র ভগ্নাবশেষকে এমন ভাবে বনে ঘিরে ধ'রেছে যে,

সে-দিকটায় সহজে প্রবেশ করা যায় না। প্রাচীর বেয়ে, বন অতিক্রম ক'রে ও লতাগুল্ম সরিয়ে প্রবেশ ক'রতে পারলেও, স্তূপাকার প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই চোখে পড়ে না। সুতরাং রাজপ্রাসাদের বাইরের দিকটার কথাই আমরা ব'ল্‌বো। সে-দিকটা এখনো সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি। বন থেকে সেটীকে বাঁচান হ'য়েছে।

পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, যশোধরপুরের প্রতিষ্ঠাতা যশোবর্ম্মণ এ-পুরীতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৮২০ খৃঃ অঃ) বসবাস আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকেই "বিমানোকসের" গৌরবের সূচনা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, প্রায় চারশো বছর ধ'রে এই প্রাসাদে কম্বোজের রাজবংশ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তা'র পরই ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হ'ন ও যশোধরপুরের গৌরবরবি অস্তমিত হয়। রাজপ্রাসাদ ব'লে এর উপর বর্ব্বরের অত্যাচার সব চেয়ে বেশী হ'য়েছিল।

রাজপ্রাসাদের চত্বর থেকে বরাবর একটী পথ পূর্ব্ব দিকে গিয়েছে। এই পথ দিয়ে নগরের প্রাচীরদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। পূর্ব্বেই ব'লেছি নগরের এই দিকটায় দু'টো দরজা। যে-দরজা দিয়ে চত্বরের পথে উঠতে হয় সেটীকে "বিজয়-দ্বার" বা সিংহদ্বার বলা হয়।

রাজপুরীতে প্রবেশ করবার এইটী ছিল সদর দরজা। চত্বরের সম্মুখে “বিমানোকসে’র বিশাল অলিন্দ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তা’র বাইরের সাজ নষ্ট হ’য়েছে মাত্র। এইটী প্রাচীনকালে ফোরামের (Forum) কাজ ক’রত। চত্বরে যে-সব ক্রীড়া-কৌতুক বা মল্লযুদ্ধ দেখান হ’ত, তা’ রাজা ও তাঁর পারিষদেরা এই অলিন্দ থেকে দর্শন ক’রতেন। বিস্তৃত সোপান দিয়ে এই অলিন্দে উঠতে হত। সোপানের দু’দিকে বৃহৎ গরুড় মূর্ত্তি দিয়ে অলিন্দস্তম্ভের শোভা বৃদ্ধি করা হ’য়েছে। অলিন্দ অতিক্রম ক’রে প্রাসাদের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে পৌছান যায়। নানা প্রাঙ্গণ ও ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়ে অন্তঃপুরের পথ। এই সব প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে-সব গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, সে-গুলির কোন্‌টা কোন্ কাজে লাগ্‌ত তা’ এখনো ভাল ক’রে বোঝা যায় না, তবে তা’র প্রত্যেক প্রস্তর-খণ্ডে অদ্ভূত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অলিন্দে দাঁড়িয়ে এই শূন্য পুরীর চারিদিকটায় একবার তাকিয়ে দেখ্‌লাম। নগর-প্রাচীর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। রাজপথের দুই পাশে নাগরিকদের গৃহের ভগ্নাবশেষ লতাগুল্মে আচ্ছাদিত হ’য়ে র’য়েছে।

কোথাও বা বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছ সে-ভগ্নাবশেষের ভিতর দিয়ে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সে কালের এই তাণ্ডব-নৃত্য দেখেছে, তাই যেন তা'র কোন ভ্রুক্ষেপ নেই—উদাসীর ভাব অবলম্বন ক'রেছে। তা'র সামনে বিজয়ী বর্ব্বরের হস্তীর পদতলে এই "বিমানোকসে"র গগনস্পর্শী চুড়া চুরমার হ'য়েছে, পুরবাসীদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হ'য়েছে, বায়ন-মন্দিরের শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি শত্রুর কোলাহলে মিশিয়ে গিয়েছে। এখন সেখানে শুধু বিষাদ-ভরা নিস্তব্ধতা।

"বিমানোকসে"র প্রাচীরের পাশ দিয়ে বনপথ বেয়ে আমরা রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দিক্‌টায় উপস্থিত হ'লাম। পূর্ব্বে বোধ হয় অন্তঃপুর থেকে এখানে যাতায়াত চ'ল্‌তো। এখানে একটি পুরাণো স্রস্‌ বিদ্যমান। সংস্কৃত সরস্‌—অর্থাৎ সরোবর—কথার রূপান্তর। স্রস্‌ অনেক ভরাট হ'য়ে গেলেও এখনো তা'তে বর্ষায় জল হয়। এ ছাড়া প্রায় প্রতি মন্দির-প্রাঙ্গণেই ছোট ছোট সরস্‌ ছিল। সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ভরাট হ'য়ে গিয়েছে। বিমানোকসের পশ্চিম দিক্‌টায় এই সরোবরকে খুব সুন্দর ক'রে খনন করা হ'য়েছিল।

চারিদিকের পাড়ই প্রস্তরে বাঁধা, তা' ছাড়া মনোরম তীর্থিকা। সেগুলি প্রায় ধ্বংস হ'য়ে গেলেও অবশিষ্ট অংশ দেখ্‌লে রাজার ও পুরবাসিনীদের সুরুচির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়। তীর্থিকার শিল্প-নৈপুণ্য দেখ্‌লেই মনে হয় যে, এই সরোবরের তটভূমি একদিন অন্তঃপুর-বাসিনীদের নুপূর ঝঙ্কারে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌তো,—তাঁদের বেণীমুক্ত কেশপাশের সৌরভে একদিন এই সরোবরতীরের বায়ু সুগন্ধময় হ'য়ে উঠ্‌তো,—তাঁদের চরণস্পর্শে জল আনন্দে নেচে উঠ্‌তো।

যশোধরপুরের প্রাচীরের ভিতর আর যে-সব ভগ্নাবশেষ আছে, সে-গুলি দেখা শেষ ক'রে আমরা পূর্ব্বদিক্‌কার "বিজয়দ্বার" দিয়ে বের হ'লাম। এর বাইরে যে-সব প্রাচীন কীর্ত্তি আছে তা'র ভিতর প্রা-খান্ (Prah Khan) এবং টা-প্রোম্ (Ta Prohm) না দেখ্‌লে দেখা শেষ হয় না। প্রা-খান্ নগর-প্রাচীরের নৈঋ‍র্ত কোণে এবং টা-প্রোম্ পূর্ব্বে। বিজয়দ্বার দিয়ে যে বর্ত্তমান সড়ক বেরিয়েছে, সেটী পুরাতন রাজবর্ত্মের রেখাই অনুসরণ ক'রেছে। সেই সড়ক বেয়ে সহজেই টা-প্রোম্ ও প্রা-খানে যাওয়া যায়। সেই সড়কে পড়বার আগে আমরা নগর-

প্রাচীরের অবস্থা দেখে নেব মনস্থ ক'রে 'বিজয়দ্বার' দিয়ে বেরিয়ে প্রাচীরের পাশ দিয়ে চ'ললাম। এখানে কোন পথ নেই, বনে ঘিরে র'য়েছে। হাত দিয়ে লতাগুল্ম স'রিয়ে, কোথাও প্রাচীর বেয়ে উঠে আমাদের পথ ক'রে নিতে হ'ল। প্রাচীর স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ-ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা আংশিকভাবে নষ্ট হ'য়েছে, কোথাও বা একেবারে ধূলিসাৎ হ'য়েছে। প্রাচীরের পাশে মাঝে মাঝে ছোট সুরক্ষিত গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এ-গুলি নগর-রক্ষক শান্ত্রীদের আবাসস্থল ছিল—দেখ্‌লেই বোঝা যায়। যে-পথে আমরা চল্‌ছিলাম্ সে-পথ ক্রমে এতই দুর্গম হ'য়ে উঠ্‌লো যে, আমরা আর বেশী অগ্রসর হ'তে না পেরে হতাশ হ'য়ে 'বিজয়দ্বারে' ফিরে এলাম ও টা-প্রোমের উদ্দেশ্যে প্রধান সড়কে বেরিয়ে প'ড়লাম।

প্রাচীন যশোধরপুরের প্রাচীরের বাইরে যে সব ভগ্নাবশেষ আছে তার ভিতর টা-প্রোম (Ta Prohm) এবং প্রা-খানই (Pra-Khan) উল্লেখযোগ্য। যশো-ধরপুরের বিজয়-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আমরা টা-প্রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্‌লাম। বিজয়-দ্বারের অনতিদূরেই

প্রধান সড়ক। দেখলেই মনে হয় প্রাচীনকালে এটা ছিল রাজপথ। যশোধরপুরের পাশ দিয়ে এটা বরাবর উত্তরমুখে গিয়েছে। এই পথ দিয়েই কম্বোজের উত্তর ভাগের নানাস্থানে এবং প্রত্যন্ত দেশ সমূহে পৌঁছান যায়। এই রাজপথের দুই পাশে এখনো নানা স্থানে পুরাণো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই সব মন্দিরের অধিনায়কদের উপর যে সেকালে রাজপথ-সংরক্ষণের কর্ত্তব্য ন্যস্ত ছিল এবং দেশের বিপন্ন অবস্থায় অস্ত্রধারণ করে তাঁরা যে কতকটা দেশ রক্ষার ভার নিতেন তা' স্বতঃই মনেই মনে হয়।

পুরাণো পথ বেয়ে যেতে ইতিহাসের অনেক কথাই মনে পড়ে। এই পথ দিয়ে কম্বোজের কত অভিযানই না গিয়েছে! একদিন যখন কম্বোজ সেনানী দিগ্বিজয় ক'রে এই পথে ফিরত, তখন যশোধরপুরের পুর-বাসিনীরা নগরের বিজয়-দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে কত মঙ্গল ঘণ্টাই না বাজিয়েছেন—বিজয়ী বাহিনীর উপর কত পুষ্পবর্ষণই না করেছেন! যুদ্ধ-প্রত্যাগত দয়িতের মিলন প্রতীক্ষায় তাঁরা এসে এই রাজপথের পাশে দাঁড়াতেন ;—অনেকের বুক উৎসাহে ও আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ত, অনেকে আবার দুঃখ-দীর্ণ হৃদয়ে সাশ্রুনেত্রে ঘরে

ফিরে যেতেন। সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা-হর্ষ-উদ্বেগ-প্লাবিত রাজপথ আজ জনকোলাহল-শূন্য—তার দু'ধার নিবিড়বনে আচ্ছন্ন প্রাচীন অশ্বত্থ বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে তার বর্ত্তমান দুরবস্থার অভিব্যক্তি স্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই অশ্বত্থ গাছের পাশ দিয়ে বনানী ভেদ ক'রে সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে আমরা টা-প্রোমের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে চল্‌লাম। নগরের বিজয়দ্বার থেকে টা-প্রোম বেশী দূর
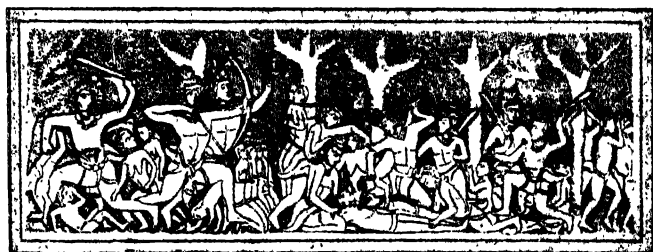
এঙ্কোর ভাট—প্রাচীরে খোদিত নরকের চিত্র।

নয়; পূর্ব্বদিকে নগর-প্রাকার থেকে এক মাইলের বেশী হবে না। টা-প্রোমের উত্তরে পুরাকালের বিশাল দীর্ঘিকা;—দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পুরাতন দূর্গের জীর্ণস্তূপ।

টা-প্রোম মন্দির কোন দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয়েছিল তা' বলা যায় না। তবে প্রোম-যে

"ব্রহ্ম" কথার রূপান্তর তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। টা-প্রোম মন্দির রাজা জয়বর্ম্মণের রাজত্বকালে (১১৮৬-১২২১ খৃঃ অঃ অনুমান) নির্ম্মিত হয়েছিল। তখন কম্বোজের গৌরবের যুগ চল্‌ছে। জয়বর্ম্মণ নিজে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী না হ'লেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে শ্রদ্ধা ক'রতেন। কম্বোজের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। টা প্রোম মন্দিরে যে সংস্কৃত লেখা পাওয়া গিয়েছে তা'তে জানা যায় যে, তিনি কম্বোজের নানাস্থানে শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এ ছাড়া বহু দেব-মন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। টা-প্রোম মন্দির তাঁর মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল, এবং এই মন্দির পরিচালনার ভার পড়েছিল রাজকুমার সূর্য্যকুমারের উপর।

টা-প্রোম মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রায় এক বর্গ মাইল স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। চারিদিকে পরিখা। প্রাচীন সেতু অতিক্রম ক'রে পূর্ব্বদ্বার দিয়ে টা-প্রোমের ভিতর প্রবেশ কর্‌লাম। পূর্ব্বে এই সেতুর দু'ধারে যে সুন্দর বেষ্টনী ছিল তা' এখন ধ্বংসে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের বাইরের প্রাচীরও এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। প্রকৃতির অত্যাচার থেকে মন্দির উদ্ধার করবার এ পর্য্যন্ত

কোনো চেষ্টা হয় নি। কোথাও ভগ্ন-চূড়া লতাগুল্মে আচ্ছাদিত হ'য়ে রয়েছে—কোথাও বা তোরণ ভেদ ক'রে অশ্বত্থগাছ উঠেছে। মন্দির প্রাঙ্গণ বনে পরিণত হয়েছে। এখানে কোনো দেব দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায় নি। তবে মন্দিরগাত্রের খোদিত চিত্রে হিন্দুধর্ম্মের অনেক পৌরাণিক কাহিনী অঙ্কিত হ'য়েছে। জয়বর্ম্মণের প্রস্তরলেখা থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে এই মন্দিরে এক সময় ষাট-সত্তর হাজার লোক পূজা দিতে আসত। মন্দিরের ভার ন্যস্ত হয়েছিল—আঠারো জন প্রধান পুরোহিত বা অধিকারীর ওপর। তাঁদের অধীনে ২৭৪০ জন সাধারণ এবং ২২৩২ জন সহকারী পুরোহিত মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকতেন। এ ছাড়া মন্দিরে ৬১৫ জন সেবাদাসী ছিল।

টা-প্রোমের মন্দির থেকে বেরিয়ে বনপথ দিয়ে আমরা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখতে চল্‌লাম। এটা টা-প্রোমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত—দুর্গম অরণ্য এ'কে ঘিরে রয়েছে। এর বর্ত্তমান নাম বান্তেই-কেদেই (Banteai-Kedei) বা পন্তেই-কেদে (Pontei Kedei)। দুর্গে প্রবেশ করবার জন্য কোন সুগম পথ না পেয়ে আমরা দুর্গ-প্রাকার প্রদক্ষিণ করেই ফিরতে বাধ্য

হ'লাম। পুনরায় বনপথ বেয়ে প্রধান সড়কে এসে পড়লাম।

এঙ্কোর-ভাটে ফিরবার পূর্ব্বে উত্তর ভাগের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসাই শ্রেয়ঃ। এর ভিতর উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে টা-প্রোমের নিকটবর্ত্তী দীর্ঘিকা এবং যশোধর-পুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত প্রা-খান (Prah-Khan)। প্রধান সড়ক বেয়ে উত্তর মুখে যেতে দীর্ঘিকা টা-প্রোমের পাশে, নগরের বিজয় দ্বার থেকে খুব বেশী দূরে নয়। এই দীর্ঘিকাকে পূর্ব্ব-বারাই (Eastern Baray) বলা হয়। এ ছাড়া আর একটি দীর্ঘিকা যশোধরপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বর্ত্তমান। এটাকে পশ্চিম-বারাই (Western Baray) বলে। আমরা এই দুই দীর্ঘিকার নাম দেব পূর্ব্ব ও পশ্চিম দীর্ঘিকা। দুইটাই আয়তনে বিশাল এবং স্থানে স্থানে এখনও বেশ গভীর। প্রায় সারা বছরই ঐ সব স্থানে জল থাকে। শীতকালে স্থানে স্থানে শুকিয়ে গেলেও দীর্ঘিকা এখনো সম্পূর্ণ ভরাট হয় নি। জলকষ্টের সময় এই দুই দীর্ঘিকাই যশোধরপুরের জল সরবরাহ ক'রত। দু'টী দীর্ঘিকারই মাঝখানে যে মন্দির আছে (Mebon of the Eeastern Baray) সেটী রাজেন্দ্রবর্ম্মণের রাজত্বকালে (৯৪৪-৯৪৭ খৃঃ অঃ)

নির্ম্মিত হয়েছিল। পশ্চিম দীর্ঘিকার মন্দির (Mebon of the Western Baray) খুব সম্ভবত রাজা যশোবর্ম্মণের সময় (৮৮৯ খৃঃ অঃ) নির্ম্মিত হয়। মন্দির-গুলি এখন ভগ্নস্তূপে পর্য্যবসিত হয়েছে। দু'টী মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনুমান হয়।

পূর্ব্ব দীর্ঘিকার ধার বেয়ে আমরা প্রা-খানে পৌঁছুলাম। পূর্ব্বেই বলেছি প্রা-খান খুব প্রাচীন। যশোধরপুর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এর নির্ম্মাণ হয়। রাজা জয়বর্ম্মণ (৮০২-৮৬৯ খৃঃ অঃ) প্রা-খানে বসবাস করতেন। তাঁর অধস্তন তিন পুরুষ পরে যশোবর্ম্মণ নূতন রাজ-পুরীর প্রতিষ্ঠা করেন। অনুমান হয় প্রা-খান বায়ন মন্দিরেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়েছিল। যশোধরপুরের উত্তর-দ্বার দিয়ে বেরিয়েও প্রা-খানে পৌঁছান যায়। প্রা-খান নগর প্রাচীরের বাইরে ঠিক নৈঋত কোণে অবস্থিত। এ রাজপুরীও কম্বোজ স্থপতিদের চিরন্তন প্রণালীতে নির্ম্মিত হ'য়েছিল। চারিদিকে প্রাচীর—তা'র বাইরে পরিখা। এই পরিখা সেতুর ওপর দিয়ে পার হ'তে হয়। প্রাচীরের ভিতরে রাজপুরীর অবস্থান। এখন তা অবশ্য ধ্বংসে পরিণত। প্রা-খানের উদ্ধার-কার্য্য এখনো আরম্ভ হয় নি। সিংহদ্বার বর্ত্তমান আছে। তবে

রাজপুরীতে প্রবেশ করবার পথ এমন দুর্গম হ'য়ে পড়েছে যে, দু'পাশে বন পরিষ্কার ক'রে নূতন পথ তৈরী করতে হয়েছে। প্রা-খানের সব অংশ দেখা সম্ভবপর নয়। যতটা আমরা দেখ্‌তে পেলাম তা'তে কম্বোজের গরিমাময় যুগের কথাই মনে হ'ল। যে যুগে বায়ন নির্ম্মিত হয়েছিল, সেই যুগেই প্রা-খানের প্রতিষ্ঠা। প্রা-খানের ভাস্কর্য্য ও খোদিত-চিত্রের ভিতর আমরা সেই যুগের দক্ষতারই পরিচয় পাই।

প্রা-খান দেখে আমরা যশোধরপুরের উত্তর-দ্বার দিয়ে নগর অতিক্রম ক'রে পুনরায় বায়নের পাশ দিয়ে এঙ্কোর-ভাটের দ্বারে ফিরে এলাম। এঙ্কোর-ভাট ভাল ক'রে দেখ্‌তে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই এঙ্কোরে আমরা যে সপ্তাহকাল ছিলাম তার ভিতর শেষ তিন দিন আমরা এঙ্কোর-ভাটই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছি। এঙ্কোর-ভাটই হচ্ছে পুরাতন কম্বোজের সবচেয়ে বড় কীর্ত্তিস্তম্ভ। কম্বোজের হিন্দু ইতিহাসের শেষভাগে এঙ্কোর-ভাটের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। তাই এখনো সেটী ধ্বংস হয় নি—সগর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এঙ্কোর-ভাট রাজা সূর্য্যবর্ম্মণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত

হয়। সূর্য্যবর্ম্মণের রাজত্বকাল ১১১২-১১৬২ খৃষ্টাব্দ। এই সুদীর্ঘকালের ভিতর তিনি নানাভাবে কম্বোজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি হচ্ছে এঙ্কোর-ভাট। ভাট কথার অর্থ মন্দির। এঙ্কোর-ভাট বিষ্ণু মন্দির। রাজা সূর্য্যবর্ম্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন —এবং সেই জন্য তাঁ'র উপাধি ছিল "পরমবিষ্ণু-

এঙ্কোর-ভাট
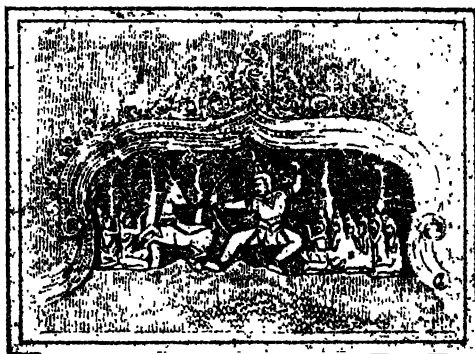
প্রাচীরে খোদিত চিত্র—রামের মায়ামৃগ বধ।

লোক"। এঙ্কোর-ভাটের নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁর রাজত্বকালে আরম্ভ হ'লেও শেষ হ'তে অনেক সময় লেগেছিল। মন্দিরের অনেক অংশ এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে, এবং তা' দেখে মনে হয় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও

(১২২১ খৃঃ অঃ) মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কম্বোজে বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব সুরু হয় এবং এর অল্পদিন পরেই কম্বোজে হিন্দুরাজত্বের অবসান হয়। তাই এঙ্কোর-ভাটের নির্ম্মাণ কার্য্য আর শেষ হয় নি। এ ছাড়া এঙ্কোরে আরও অনেক মন্দির অসমাপ্ত রয়েছে।

এঙ্কোর-ভাটের পাঁচটী চূড়ার ভিতর হু'টী অসম্পূর্ণ; কিন্তু তবুও মন্দিরের সবটা দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। যশোধরপুরের প্রাকার থেকে এঙ্কোর-ভাট খুব বেশী দূরে অবস্থিত নয়। সেতুর ওপর দিয়ে সুবৃহৎ পরিখা পার হ'য়ে মন্দিরের চত্বরে পৌঁছুতে হয়। এই পরিখাটি সুগভীর। এখনো জলে ভরা। সেতুর কার্য্য শেষ হ'তে পারে নি ব'লে অনুমান হয়। সেতুর হু'দিকের বেষ্টনী অসমাপ্ত র'য়ে গিয়েছে। সুপ্রশস্ত মন্দির চত্বরে খণ্ড খণ্ড প্রস্তর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে। স্থপতি সেগুলিতে মন্দিরের কার্য্যে লাগাবার সময় পায়নি।

মন্দির নানা স্তরে বিভক্ত। প্রধান প্রতিষ্ঠানে পৌঁছুতে গেলে বহু চত্বর ও অলিন্দ অতিক্রম ক'রে উচ্চ সোপান বেয়ে উঠ্‌তে হয়। প্রতি চত্বরে দেব সেবার জল রাখবার জন্য দ্রোণী ছিল। মন্দিরে প্রধান

প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও বহু ছোট প্রতিষ্ঠান ছিল। মন্দিরের প্রাচীর গাত্র খোদিত চিত্রে পরিশোভিত। কোথাও রামায়ণের কাহিনী, কোথাও পৌরাণিক কথা, কোথাও নরকের চিত্র এবং কোথাও বা
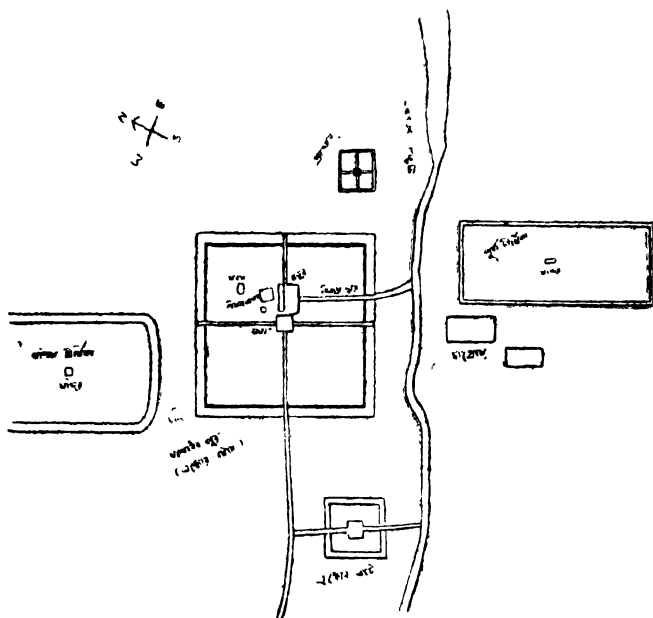
এঙ্কোরের নক্সা

মহাভারত এবং হরিবংশের ধর্ম্ম-কাহিনী ভাস্করের সুনিপুণ হস্তে মূর্ত্তি পেয়েছে। প্রতি তোরণ নানা

ভাস্কর্য্যে শোভিত। দেখ্‌লেই মনে হয় যেন কম্বোজের শিল্পীদের মনের পটে তা'দের অদূর ভবিষ্যতের বিষাদ কাহিনী প্রতিভাত হয়েছিল। তাই এঙ্কোরের এই শেষ কীর্ত্তির ভিতর তা'দের প্রতিভার চরম পরিচয় দিয়ে গিয়েছে। বায়নে যে কলানৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় তা' অনেকস্থলে এঙ্কোর-ভাটের চেয়ে উচ্চাঙ্গের হ'লেও এঙ্কোর-ভাটে নানা শক্তির একত্র সমাবেশ হয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে এঙ্কোর-ভাটের অনতিদূরে অল্পদিন থেকে একটী বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ স্থাপিত হয়েছে। এঙ্কোর যখন শ্যামদেশের অন্তর্ভূক্ত হয় তখন থেকেই বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি একটু বেড়েছে। এঙ্কোর-ভাটেও এদের হাত কিছু পড়েছে এবং মন্দিরের ছু' একটী কক্ষে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য এ স্থাপনার ভিতর কোন প্রাণের সাড়া নাই।

কিছুদিন থেকে সাইগণের ভারতীয় বণিকদের মধ্যে একটু ধর্ম্মভাব জেগেছে এবং তাঁরা কিছু অর্থব্যয় ক'রে এঙ্কোর-ভাটে নিয়মিত ভাবে প্রদীপ জ্বালবার ব্যবস্থা করেছেন। যে প্রদীপ সাতশো বছর ধ'রে নির্ব্বাপিত ছিল তা' আবার জ্বলেছে। তাই আশা হয়

ভারতসন্তানদের চেষ্টায় আবার এঙ্কোরের ভাঙ্গা মন্দিরে নূতন করে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে। মন্দির-চত্বর হয়ত আবার ভারত সন্তানের কলধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠ্‌বে।

এঙ্কোর-ভাট দেখেই আমাদের এঙ্কোর দেখা শেষ ক'রতে হ'ল। ভারতের প্রাচীন ঔপনিবেশিকদের যে কীর্ত্তি ছ'মাস ধ'রে দেখলেও চোখ তৃপ্ত হয় না আমাদের বাধ্য হ'য়ে তা' এক সপ্তাহে শেষ ক'রতে হ'য়েছে। তবে যা দেখেছি তা'তে স্তম্ভিত হ'য়েছি। হাজার বছর পূর্ব্বে ভারত-সন্তানেরা এই সাগর পারে এসে ভারত-মাতার যে বিজয়-স্তম্ভ স্থাপনা ক'রেছিলেন তা' কালের অনেক অত্যাচার সহ্য ক'রে আজও দাঁড়িয়ে আছে—শুধু ভারতের গৌরব কাহিনীর কথাই মনে ক'রিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্র পারের বর্ব্বরজাতিদিগকে তাঁরা কার্য্যদক্ষ ক'রেছিলেন। তা'দের ভিতর স্থপতির ও শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছিল—কলা-নৈপুণ্য তা'দের কাজের ভিতর ফুটে উঠেছিল। অভ্যাগত দীক্ষাগুরুর নিকট তা'রা শিক্ষালাভ ক'রেছিল ও সে শিক্ষাকে ফলবতী ক'রতে পেরেছিল। তা'ই তা'দের নামও স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

এঙ্কোরের কীর্ত্তি দেখ্‌লে যে আশ্চর্য্য হ'তে হয় তা'র

প্রধান কারণ এর প্রতি মন্দির ও রাজপ্রাসাদ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই সব প্রস্তর প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড় থেকে সংগৃহীত হ'য়েছিল। পাহাড়ের যে স্থান থেকে প্রস্তর সংগৃহীত হ'ত তা' খুঁজে বের করা হয়েছে। যশোধরপুর ও এঙ্কোর-ভাট নির্ম্মাণ ক'রবার জন্য প্রস্তর সংগ্রহ ক'রতে যে লোকবলের আয়োজন ক'রতে হ'য়েছিল তা' শুধু বিশেষ পরাক্রমশালী রাজার পক্ষেই সম্ভবপর।

সে-রাজার ঐশ্বর্য্য আজ শুধু কল্পনার বস্তু। শুধু প্রস্তর ফলকে তা'র গৌরব আজ নিবদ্ধ। কম্বোজের দুর্ভেদ্য বনানীর ভিতর তা'র কীর্ত্তি আজ লুক্কায়িত। মানুষের কত অভিযান কম্বোজের বুকের ওপর দিয়ে গিয়েছে। নিত্য নূতন জাত তা'র বুকের ওপর নূতন আবাসস্থল তৈরী ক'রেছে—নূতন নগর নির্ম্মাণ ক'রেছে। কিন্তু তেমন আর ক'রতে পারে নি। প্রাচীন যশোধর-পুরের শ্রী এতটুকুও তা'রা ফিরিয়ে আন্তে চেষ্টা করে নি। বিপ্লবের দিনে এ যশোধরপুরের মন্দিরে মন্দিরে পূজারীর হাত থেকে যে পূজার শঙ্খ লুটিয়ে ধূলায় পড়েছিল তা' আর বাজে নি। মন্দির চূড়ায় কাজ কর্তে কর্তে স্থপতি যেখানে থেমে গিয়েছিল—সে

কাজ সমাপ্ত ক'রবার জন্য আর কেউ সেখানে হাত দেয় নি। চিত্রকর তার খোদিত চিত্র অর্দ্ধসমাপ্ত রেখে গিয়েছে। কোথাও বা মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শুধু আরম্ভ হয়েছিল—তা' আর শেষ হয় নি। নির্ম্মাণকল্পে যে প্রস্তর সংগ্রহ করা হয়েছিল তা' মন্দির প্রাঙ্গণে স্তূপাকার হ'য়ে রয়েছে। সাতশো বছর পূর্ব্বে যেখানে সেগুলি ছিল সেখানেই রয়েছে—কা'রো হাত তা'তে পড়ে নি। যা'দের কলধ্বনিতে যশোধরপুর একদিন মুখরিত হ'ত তা'দের এমন কেউ নেই—যে এ-ভগ্নপুরীতে একটী প্রদীপ দেয়। কোন্ দেবতার অভিশাপে কম্বোজের এ-মহানগরীর যে এই শোচনীয় দশা হয়েছে তা' মানুষ বল্‌তে পারে না।

আবার যদি কোন ভারত সন্তান কম্বোজের এই সমুদ্রতীরে পদার্পণ করেন, অনুরোধ করি, যেন তিনি এই বনপথ বেয়ে এসে যশোধরপুরীর মন্দির প্রাঙ্গণে তার পূজা দিয়ে যান। সাতশো বছর ধরে কোন ভারতীয় পর্য্যটক এ-পথে আসেন নি—ভারতের এ কীর্ত্তিস্তম্ভের উদ্দেশ্যে তাঁর নমস্কারও জানিয়ে যান নি। ভারতের এ অতীত গৌরব কাহিনীকে যদি নূতন ক'রে শোনাতে চান—উৎসাহের আগুণ যদি আবার ছড়িয়ে

দিতে চান—অনুরোধ করি কম্বোজের এই জনহীন পথ বেয়ে যেন তাঁরা দুর্ভেদ্য বনানীর ভিতর তাঁদের কৃতী পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি-রেখা দর্শন করে যান। ভারত-ইতিহাসের এক বড় গৌরবের কাহিনী তা'র ভিতর নিহিত রয়েছে।

চম্পার পথে

কম্বোজের বিষাদভরা স্মৃতি নিয়ে আমরা সাইগণে ফিরলাম। এবার প্রাচীন চম্পা দেখবার কথা। কিন্তু দু'সপ্তাহ ধ'রে কম্বোজের বনে বনে ঘুরে আমরা এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে হঠাৎ কোথাও নড়বার সামর্থ ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে সাইগণের এক ফরাসী হোটেলে চার পাঁচ দিনের মত আশ্রয় নেওয়া গেল। হোটেল ফরাসী বটে কিন্তু কাজ চালায় আনামীরা। তারা কেউ ইংরাজী জানে না। ফরাসী ভাষাও এমন অদ্ভুত ভাবে বলে যে তা' বুঝতে বহু ভাষা-জ্ঞানের আবশ্যক। প্রথমতঃ আনামী ভাষার উচ্চারণ-নীতি জানা চাই, তারপর সেই উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে

ফরাসী ভাষায় কথা কইলে কিরূপ শোনাতে পারে সে সম্বন্ধে গবেষণা থাকা চাই। সুতরাং সাইগণে যে ক'দিন ছিলাম সে ক'দিন হোটেল কথা কইবার চেষ্টা মোটেই করি নি।

সাইগণে কয়েকদিন বিশ্রাম করবার পর আমরা চম্পার উদ্দেশ্যে রওনা হ'বার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। এইবার চম্পার কথা বলা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে ইন্দোচীনে চম্পা নামে কোন দেশ নেই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে চম্পা নাম লোপ পেয়েছে। চম্পা ছিল ভারতের আর এক উপনিবেশ। বর্ত্তমান কোচীন-চীন ও আনাম প্রদেশ নিয়ে প্রাচীনকালে চম্পা রাজ্য গঠিত হয়েছিল। ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা দেশ মাতৃকার নামে এই নূতন উপনিবেশের নামকরণ করেছিলেন অনুমান হয়। ভারতে যে চম্পা রাজ্য ছিল সে হ'চ্ছে বর্ত্তমান ভাগলপুর অঞ্চল। এই চম্পাপুরীই ছিল চাঁদ সদাগরের চম্পা। অতি প্রাচীন-কালেই যে এই চম্পাপুরীর নৌবহর দেশ বিদেশে যেত, তা'তে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় অব্দের প্রথমে যে চম্পার বণিকেরা তাম্রলিপ্তির বন্দর হয়ে সাগর অতিক্রম ক'রে পূর্ব্ব মুখে বাণিজ্য করতে যেত

তা'রও প্রমাণ আছে। বণিকদের অর্ণবপোতেই ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা দেশ বিদেশে যেতেন। হয়ত তাঁদেরই একদল আনামের উপকূলে অবতরণ ক'রে খৃষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে চম্পায় হিন্দু উপনিবেশের প্রথম সূচনা করেন। এই উপনিবেশ ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোচীন-চীন থেকে বর্ত্তমান টঙ্কিন (Tonkin) পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ তা'র অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্ত্তমান আনামীরা তখন টঙ্কিনের উত্তরে বাস করত। তাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে চম্পারাজ্য ধ্বংসে পরিণত হয়। আনামীরা নূতন রাজ্যের পত্তন করে ও দেশের নূতন নামকরণ করে—আনাম।

সেই থেকে চম্পার নাম লোপ পেয়েছে। আনামীদের অত্যাচারে চম্পার প্রাচীন অধিবাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কম্বোজের নানাস্থানে তা'রা এখন বহু কষ্টে দিনাতিপাত করে। তাদের পুরানো গৌরব কাহিনী তা'রা ভুলে গিয়েছে। ভারতের সঙ্গে তা'দের নিকট সম্বন্ধের কথাও তাদের মনে নেই। এই প্রাচীন অধিবাসীর একটী শাখা আনামের দক্ষিণাংশে ছোট দু'টী গ্রামে বাস করে।

আনামীদের হাতে বহুভাবে নিপীড়িত হয়েও তারা মাতৃ-ভূমির অঙ্ক ত্যাগ করেনি। তাদের পূর্ব্ব পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে পূজা না দিলে তা'রা এখনো প্রাণে শান্তি পায় না। এদের বর্ত্তমান নাম চ্যাম (Cham)—চম্পা নামেরই অপভ্রংশ। পুরাণো হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ যথাসম্ভব দেখাই আমাদের চম্পা যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। ফিরবার পথে বর্ত্তমান চ্যামদের দু'এক খানি গ্রাম ও তা'দের পূজা-পদ্ধতি ও আচার ব্যবহারও দেখে আস্‌বার ইচ্ছা ছিল।

* * *

আনাম, কম্বোজের মত নদীমাতৃক দেশ নয়। পাহাড় ও উচ্চভূমিতে ভরা। আনামের দক্ষিণাংশে রেলপথ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অংশে রেলপথ না থাকায় ভ্রমণ কষ্ট-সাধ্য। সমুদ্রপথে রাজধানী হুয়ে (Hue) ও অন্যান্য স্থানে যওয়া যায়। কিন্তু তা'তেও নানা অসুবিধা। শীতকালে মোটরে অনেক স্থানে যাওয়া সম্ভবপর কিন্তু বর্ষার সময় পথ ঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়। আনাম ফরাসীদের করদরাজ্য। শাসন বিষয়ে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষরা রাজাকে সাহায্য ক'রে থাকেন।

সুতরাং বর্ত্তমানে আনামের স্বাধীনতার অনেক খর্ব্ব হ'য়েছে।

আমরা যখন সাইগণ থেকে রওনা হ'লাম তখন বর্ষা। বৃষ্টিপড়া আরম্ভ হয়েছে। সুধু আনামের দক্ষিণাংশ ছাড়া অন্যান্য স্থান দেখবার আশা আমরা ত্যাগ করেই বেরিয়েছিলাম। সাইগণ থেকে আমরা একদিন ভোর বেলায় গাড়ী ধ'রে রওনা হ'লাম। দক্ষিণ আনামের ফান্-রাং (Phan-rang) নামক স্থানে প্রথম থামব কথা ছিল। ফান্-রাং সাইগণ থেকে প্রায় ২০০ মাইল। সাইগণ থেকে বেরিয়ে আমাদের পূর্ব্বে যেতে হবে। সাইগণ থেকে কিছু দূরে গেলেই আনামের পাহাড় শ্রেণীর আরম্ভ। সমতল ভুমি ছেড়ে ছোট ছোট পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পথ। কোথাও বা ছোট নদীর উপত্যকা অতিক্রম ক'রে, কোথাও বা ঘন বন ভেদ ক'রে আমাদের গাড়ী চলেছে। পাহাড়ের ওপর কোথাও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চোখে প'ড়ছে। এখানে আর কম্বোজের মত উর্ব্বর সমতল প্রদেশ চোখে পড়ে না। ঘন নারিকেল বনের সমাবেশও এখানে নেই। রেলপথ অনেক স্থানে সমুদ্রের উপকূল দিয়ে চলেছে। সুন্দর দৃশ্য। একদিকে চীন সাগরের বিশাল বক্ষ—প্রায়

সব সময়েই উদ্দাম তরঙ্গে উদ্বেল হ'য়ে রয়েছে। অন্যদিকে আনামের পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চ শিখর প্রদেশ—ঘন বন-রাজিতে আবৃত দেখা যাচ্ছে। এই সুন্দর পথ দিয়ে আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফান্-রাং পৌঁছুলাম।

ফান্-রাং সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত, বর্ত্তমান আনামের একটী ছোট বন্দর। বড় জাহাজ এখানে না ভিড়লেও ছোট ষ্টীমারের খুব চলাচল আছে। তা' ছাড়া চীনেদের ও আনামীদের সাম্পান। সাম্পান্ পুরাণো কালের অর্ণবপোতের স্মৃতি এখনো বহন করছে। এ গুলি পালে চলে, এবং এতে ক'রে চীনেরা এখনো বিশাল সমুদ্র অতিক্রম ক'রে ও চীন থেকে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করে। ফান্-রাং প্রাচীন কালে চম্পার একটি বড় বন্দর ছিল। সেকালে এর নাম ছিল পাণ্ডুরঙ্গ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও পাণ্ডুরঙ্গ নাম প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান ফান্-রাং যে পাণ্ডুরঙ্গ কথারই রূপান্তর তা' সহজেই বোঝা যায়।

চারটী প্রদেশ বা বিষয় নিয়ে প্রাচীন চম্পা রাজ্য গঠিত হয়েছিল। প্রথম যুগে অমরাবতী, বিজয়, কৌঠার এবং পাণ্ডুরঙ্গ এই চারটি বিষয় এক রাজার অধীনে ছিল। মধ্যযুগে পাণ্ডুরঙ্গ ও

কৌঠারের অধিপতিরা একটী পৃথক রাজ্যের স্থাপনা করেছিলেন।

অমরাবতী ছিল বর্ত্তমান আনামের উত্তর ভাগে। ও তা'র রাজধানী ছিল ইন্দ্রপুর। অমরাবতী বর্ত্তমান কুয়াং-নাম (Quang nam)। ইন্দ্রপুরীর ভগ্নাবশেষ কুয়াং-নামের নিকট ডং-ডুয়ং (Dongduong) নামক স্থানে অবস্থিত। অমরাবতীর বন্দর ছিল সিংহপুর। সিংহপুর বর্ত্তমান তুরান (Touran) বন্দরের নিকটেই অবস্থিত ছিল। বিজয় বর্ত্তমান বিন্-দিন্(Binh-dinh)। বিজয়ের প্রধান বন্দর ছিল শ্রীবিনয়। শ্রীবিনয় বর্ত্তমান বিনদিনের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। কৌঠার হচ্ছে বর্ত্তমান খান-হোয়া (Khan-hoa)। কৌঠারের রাজধানী বর্ত্তমান না-ত্রাং (Nha-trang)এর নিকট অবস্থিত ছিল। আর পাণ্ডুরঙ্গ কিছুকালের জন্য সমস্ত চম্পার রাজধানীতে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। পাণ্ডুরঙ্গেই চম্পার অধিবাসীরা আনামীদের শেষ বাধা দিয়েছিল।

ফান্-রাংকে আমরা পুরাণো নামেই (পাণ্ডুরঙ্গ) অভিহিত করবো। পাণ্ডুরঙ্গে সন্ধ্যাবেলা পৌঁছে আমরা সেখানকার সরকারী বাংলোতে আশ্রয় নিলাম। আনামের প্রায় সব স্থানেই বাংলো আছে। রাজধানী

হুয়ে (Hue) ছাড়া কোথাও হোটেল নেই। তাই পাণ্ডুরঙ্গে ক'দিন আমরা সরকারের অতিথি—হিসাবে ছিলাম আহারাদির ব্যবস্থা ছিল ফরাসী রেসিডেন্টের গৃহে। আনামে ও কম্বোজে প্রায় সমস্ত বিভাগের প্রধান সহরেই ফরাসীদের একজন প্রধান কর্ম্মচারী আছেন (Resident Superieure)। এঁরা শাসন বিষয়ে করদ রাজ্যের কর্ম্মচারীদের সাহায্য করে থাকেন—প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই শাসন করেন। শাসন-দক্ষতা তাঁদের যাই থাকুক তাঁরা অতিথি-সৎকার ভালভাবেই করতে জানেন। সত্যকার ফরাসীদের মতই সদালাপী এবং সহৃদয়।

চম্পার ধ্বংসাবশেষ

পাণ্ডুরঙ্গের অনতিদূরে একটী প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরের নাম হচ্ছে পো-ক্লাংগ-রাই (Po-klaung-rai)। পো-ক্লাংগ-রাই সংস্কৃত "শ্রীলিঙ্গরাজ" কথার রূপান্তর। চ্যামদের ভাষায় "পো" কথা 'শ্রী'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়ে আস্‌ছে। এই মন্দির দেখাই আমাদের প্রথম কাজ। মন্দিরটী ছোট একটী পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে—কিন্তু একেবারে ধ্বংসে পরিণত হয় নি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে চম্পার প্রায় সকল মন্দিরই কোন পাহাড় অথবা উচ্চ ভূমিভাগের উপর নির্ম্মিত। সুতরাং বর্ষায় মন্দির নষ্ট হ'বার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। চম্পার মন্দিরগুলি

কম্বোজের মন্দিরের ন্যায় বিপুলাকার নয়; অপেক্ষাকৃত ছোট। নির্ম্মাণ-প্রণালীও একটু পৃথক। এই সব কারণেই চম্পার অনেক মন্দির এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তবে উত্তর চম্পা, অর্থাৎ প্রাচীন অমরাবতী ও বিজয়ের মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংসে পরিণত। বিজেতা আনামীরা এগুলিকে ইচ্ছা ক'রে নষ্ট করেছিল। পাণ্ডুরঙ্গেও এই একটী মন্দির ছাড়া আর কোন প্রাচীন নিদর্শন নেই। কিছু দিনের জন্য পাণ্ডুরঙ্গ সমস্ত চম্পার রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। তা' ছাড়া পাণ্ডুরঙ্গের স্বতন্ত্র অধিপতিরাও ছিলেন। কিন্তু এঁদের প্রাচীন রাজপুরীর নিদর্শন বর্ত্তমানে কিছুই নেই। আছে শুধু "শ্রীলিঙ্গরাজের" মন্দির। এই মন্দিরে ও এর নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক সংস্কৃতে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। লেখাগুলি প্রায় সবই খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর। এসব লেখায় মন্দিরের নির্ম্মাণকালের কোনই খোঁজ পাওয়া যায় নি। মন্দিরটী খুব সম্ভব খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল। কারণ চম্পার সেইটী হচ্ছে গৌরবের যুগ।

শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দির পাথরে নির্ম্মিত। এ মন্দিরে কোন ভাস্কর্য্য লক্ষিত হয় না, খোদিত চিত্রও নেই।

স্থাপত্যের ভিতর একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু কম্বোজের প্রতি মন্দিরে যে সৌন্দর্য্য ও শিল্পদক্ষতা ফুটে উঠেছে, চম্পায় তা' কোথাও দেখি নি। চম্পার মন্দিরগুলি দুর্গ-বিশেষ, এবং বাইরের থেকে আক্রান্ত হলে চম্পার প্রাচীন অধিবাসীরা এ উচ্চ ভূমিভাগ থেকে যে শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রত, মন্দিরের গঠন প্রণালী দেখলেই তা' অনুমিত হয়।

সেকালে শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃতলেখা ও মন্দিরের নাম থেকে তা' সহজেই বোঝা যায়। হিন্দু ঔপনিবেশিকেরা প্রায় সকলেই শৈব ছিলেন। চম্পার আদিম অধিবাসীরাও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে চম্পায় বৌদ্ধধর্ম্মেরও প্রচার হয়েছিল। শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দিরের দ্বারের উপরেই একটী শিবমূর্ত্তি। শিবমূর্ত্তি ষড়্‌ভূজ, উপরের দু'হাতে বজ্র ও পদ্ম, মাঝের দু'হাতে খড়্‌গ ও পাত্র। নীচের দু'হাত পশ্চাতে ফেরানো। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলেই একটী পাথরে নির্ম্মিত সুন্দর নন্দী-মূর্ত্তি। নন্দীর সম্মুখেই মুখলিঙ্গ। এখনো নিকটবর্ত্তী গ্রাম থেকে চ্যাম অধিবাসীরা মন্দিরে পূজা দিতে আসে। আমরা যেদিন মন্দির দেখতে যাই

সেদিন তা'রা পূজা দিতে এসেছিল। এদের পূজা-পদ্ধতি ভারতের হিন্দু ধারাই অনুসরণ করে।

চ্যামদের প্রধান পুরোহিত মুখলিঙ্গের পূজায় বস্‌বার পূর্ব্বে নূতন কাপড় পরলেন ও হাত পা' ধুয়ে নিলেন। চ্যামদের মেয়েরা পূজার উপকরণ এনে মুখলিঙ্গের সাম্‌নে রাখলেন। উপকরণের ভিতর ভাত, মাংস প্রভৃতিও ছিল। পূজারী পুষ্প-পাত্র হাতে নিয়ে পূজায় বসে প্রথমে মন্ত্র পড়ে আচমন করলেন তার পর নানারূপ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে শাঁখ ও ঘণ্টা বাজিয়ে ফুল দিয়ে মুখলিঙ্গের পূজা করলেন। এ সব মন্ত্র চ্যামদের নিজেদের ভাষায় লেখা। অনেক সংস্কৃত শব্দ রূপান্তরিত হয়ে এতে ঢুকেছে। দেবতার উদ্দেশ্যে উপকরণ উৎসর্গ ক'রে পূজারী আগুন জ্বেলে হোম ও অঙ্গুলি-সমাবেশে নানারূপ মুদ্রা-সাধন করলেন। পূজায় যে সব পাত্র ব্যবহার করা হ'ল সেগুলি প্রায়ই তাম্রপাত্র। তা'র ভিতর অনেকগুলিই আমাদের পূজায় ব্যবহৃত পাত্রের অনুরূপ—পুষ্পপাত্র, তাম্রকুণ্ড, কোশাকুশি প্রভৃতির ন্যায়। হোম শেষ হ'লে পূজারী "নি নোমস" (ওঁ নমঃ) উচ্চারণ ক'রে মন্দির দ্বারের শিবমূর্ত্তির ওপর তাম্রকুণ্ডের জল নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর পূজা শেষ হ'ল।

এই পূজাপদ্ধতি প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি বহন করছে। বর্ত্তমান চ্যামেরা অবশ্য হিন্দুদের নাম পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছে। নিজেদের দেব-দেবীর ও তা'রা নাম জানে না।

* * * *

চ্যামদের পূজা দেখা শেষ করে আমরা তা'দের গ্রাম দেখ্‌তে গেলাম। 'শ্রীলিঙ্গরাজে'র মন্দির থেকে তা'দের গ্রাম প্রায় ছু' মাইল দূরে অবস্থিত। পাশাপাশি ছু'খানি গ্রাম—চারদিকে মাঠ। গ্রামের পাশে কোন নদী নেই। তা'রা সাধারণতঃ কূয়ার জলে নিজেদের কাজ চালায়। গ্রামে কোন গাছ নেই। চ্যামেরা ইচ্ছা ক'রে গাছ কেটে ফেলে, কারণ তা'দের মতে গাছ হচ্ছে ভূতপ্রেতের আবাসস্থল। ছু'খানি গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস। সকলের অবস্থাই দারিদ্র-ক্লিষ্ট। কোন গৃহেরই শ্রী নেই। এদের মুখের উপর উৎপীড়নের সুস্পষ্ট চিহ্ন আঁকা রয়েছে। কোন উৎসাহ বা হাসির রেখা সেখানে নেই। সকলেই কষ্টে দিনপাত করে। গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই এবং এদের ছেলেরা কখনো লেখাপড়া শেখবার সুবিধা পায় না—ইচ্ছাও তা'দের নেই। আনামীদের হাত থেকে এদের বাঁচাবার কোন বিশেষ চেষ্টা ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ এখনো করেন নি।

আনামের এই মুষ্টিমেয় চ্যামরা এখনো পুরাতন ধর্ম্মাবলম্বী (অর্থাৎ হিন্দু) রয়েছে। এদের বলা হয় "জাতচ্যাম" (Cham jat) অর্থাৎ খাঁটী চ্যাম। কোচীন চীন ও কম্বোজে যে সব চ্যাম আছে তাদের অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত। তা'দের নাম "বাণী চ্যাম" বা "আস্‌লাম চ্যাম"। তা'রা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। "জাত-চ্যাম"দের এরা "কফির" (Kaphir-কাফির) নামে অভিহিত করে। এদের সঙ্গে হিন্দু চ্যামদের অবশ্য কোন বিবাদ নেই। কারণ মুসলমান হ'লেও তা'রা নিজেদের প্রাচীন আচার ব্যবহার অনেক বজায় রেখেছে।

এইবার চ্যামদের গোড়ার খবর কিছু বলবো। চ্যামেরা মন-খ্মের (Mon-khmer) জাতির শাখা-বিশেষ। কম্বোজের প্রসঙ্গে বলেছি যে কম্বোজীয়েরাও এই জাতির একটী শাখা। চ্যামেরা ছিল প্রাচীন কোচীন-চীন ও আনামের আদিম অধিবাসী। অনুমান খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুরা যবদ্বীপ থেকে জলপথে এসে এ'দের দেশে উপনিবেশ বিস্তার করেন ও নূতন উপনিবেশের নাম দেন চম্পা। দেশ-বাসীরাও ক্রমশঃ ঐ নামে পরিচিত হ'তে থাকে। চম্পার

অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা নেয় এবং ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা হ'ন তা'দের দীক্ষা-গুরু। তা'রা ভারতীয় সভ্যতায় দীক্ষালাভ ক'রে ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠ্‌ল। তাদের ভিতর শিল্পী স্থপতির সৃষ্টি হ'ল। ভারতীয় লেখা-পদ্ধতি তারা গ্রহণ করল ও ভাষাকে মার্জ্জিত ক'রে গড়ে তুল্‌লো। এ'দের ভাষায় বহু শিলা-লেখ ও ধর্ম্মকথা পাওয়া গিয়েছে। সে ভাষার উপর অবশ্য সংস্কৃতের খুবই প্রভাব দেখা যায়। কারণ সংস্কৃত ছিল বিজেতাদের দেবভাষা।

বর্ত্তমান চ্যামদের ভাষা থেকে এখনো সে সংস্কৃত প্রভাব নষ্ট হয় নি। দৈনন্দিন ব্যাপারে তা'রা যে ভাষা প্রয়োগ করে তার ভিতর অনেক সংস্কৃত কথা রূপান্তরিত হ'য়ে রয়েছে। পাণ্ডুরঙ্গের চ্যামদের থেকে যে ক'টী কথা সংগ্রহ করেছিলাম তার দু'একটী নমুনা দিলেই এ কথা বোঝা যাবে—

দিকের নাম ঃ—পুর—পূর্ব্ব, দক্—দক্ষিণ, উৎ—উত্তর, অগ্নি—আগ্নেয়, নৈলত—নৈঋর্ত্য, বাহোপ্—বায়ব্য, এষন্—ঈশান।

সপ্তাহের দিনগুলির নাম ঃ—থোম—সোম, এঙ্কর—

(আঙ্গিরস)—মঙ্গল, * বুথ—বুধ, জিপ্—জীব (বৃহস্পতির নামান্তর), স্থক—শুক্র, থন্থর—শনৈশ্চর—শনি, আদিৎ—আদিত্য—রবি।

সূর্য্যের নাম আদিৎ—আদিত্য, সহরের নাম নোকর—নগর, মন্দিরের নাম মোধির। রাজাকে চ্যামেরা রায়, মন্ত্রীকে মোত্রি বলে। চ্যামদের ভাষায় সংস্কৃতের আরও অনেক প্রভাব দৃষ্ট হয়। তাদের যে সব ধর্ম্মকথা রয়েছে সেগুলির সমালোচনা করলে আরও অনেক কথার খোঁজ পাওয়া যায়।

চ্যামদের গ্রাম দেখে ফিরবার পথে আরও দু'একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে পেলাম; প্রায় সব স্থানেই প্রাচীন সংস্কৃত লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুরঙ্গের আনামী অধিবাসীরা এ সব সম্বন্ধে কোনই খোঁজ নেয় না। যেটুকু কাজ হয়েছে তা' ফরাসী পণ্ডিতেরাই করেছেন। হ্যানয়ের প্রাচ্য-বিদ্যাপীঠই এ সব প্রাচীন মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন ও গত ত্রিশ বছর ধরে বহু কাজ করেছেন।

* মঙ্গলবারের নাম আঙ্গিরস বলায় বুঝতে হ'বে ভুল। কিন্তু এঙ্কর, 'আঙ্গিরস' শব্দেরই অপভ্রংশ বলে মনে হয়।

পাণ্ডুরঙ্গে হিন্দুকীর্ত্তির সমস্ত নিদর্শন দেখে আমরা বাংলোতে ফিরলাম। পরদিন প্রত্যূষে প্রাচীন কৌঠার (বর্ত্তমান না-ত্রাং) প্রদেশ দেখতে রওনা হ'ব স্থির করা হ'ল। সন্ধ্যায় সমুদ্রতীর দেখ্‌তে বেরুলাম। তটদেশে বর্ত্তমান যুগের কোনই নিদর্শন চোখে পড়ে না। পুরাণো ধরণের সাম্পান সারি সারি বাঁধা রয়েছে। কোনটীর মাস্তুলে পাল জড়ান, কোনটীর মাস্তুল নীচে নাবান। চীনা মাঝিরা কোনটীতে বা পাল খাটিয়ে সাগর অতিক্রম করবার আয়োজন করছে। এদের প্রধান পণ্য-সম্ভার হচ্ছে নারিকেল, কলা ও নানাপ্রকারের মসলা। কোথাও বা মাঝিরা মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়ে আহারাদির ব্যবস্থা করছে। অদূরে পাণ্ডুরঙ্গের ক্ষুদ্র পর্ব্বত-মালা দেখা যাচ্ছে। ঘন বন পাহাড়গুলিকে ঘিরে এক অভিনব শোভার সৃষ্টি করছে।

সন্ধ্যার শেষে পাণ্ডুরঙ্গের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের অনেক পুরাতন স্মৃতি মনে জেগে ওঠে। দু'হাজার বছর পূর্ব্বে ভারত সন্তানেরা সাগরপথে যখন এই উপকূলে পৌঁছেছিলেন তখন তাঁদের অভিনন্দন জানাবার মত কেউ এখানে ছিল না। অপরিচিত

বর্ব্বরের দেশে এসেছিলেন। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে তাঁরা যে কাজ করেছিলেন, তার গরিমাময় ইতিহাস শোনাবার মত এখানে আর কেউ নেই। সে ইতিহাস এখন ভগ্নমন্দিরের প্রস্তর-ফলকে নিবদ্ধ। ভারতের সে কীর্ত্তিগাথা গাইবার মত এ উপকূল-ভাগে আর একজনকেও আজ দেখা যায় না। ভারতের অর্ণবপোত বহু শতাব্দী ধরে যখন চীনে যেত, তখন ভারত সন্তানেরা এই পাণ্ডুরঙ্গে অবতরণ ক'রে স্বদেশের কীর্ত্তিমান সন্তানদের সঙ্গে হয়ত দেখা করে যেতেন। আজ আর এক ভারতসন্তান এই উপকূলভাগে এসেছে —কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দের আর এখানে কেউ নেই।

পাণ্ডুরঙ্গ দেখা শেষ ক'রে আমরা কৌঠার যাত্রা করলাম। পূর্ব্বেই বলেছি কৌঠার হ'চ্ছে বর্ত্তমান খান-হোয়া (Khan-hoa) প্রদেশ। খান্-হোয়ার রাজধানী হ'ল না-ত্রাং (Nha-Trang)। প্রাচীনকালে কৌঠার ছিল চম্পার একটী প্রধান বিষয়। কৌঠারের রাজধানী পো-নগরের ভগ্নাবশেষ না-ত্রাং-এর অনতি-দূরেই অবস্থিত। না-ত্রাং থেকেই প্রাচীন কৌঠারের কীর্ত্তিসমূহ দেখা সহজসাধ্য। তাই না-ত্রাংই হ'ল আমাদের লক্ষ্যস্থল।

ফান-রাং থেকে সকাল বেলা আমরা না-ত্রাং-এর উদ্দেশে বের হ'লাম। এখানে আমাদের একজন নূতন সহযাত্রী জুটলেন। ইনি একজন ওলন্দাজ কুমারী। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। ইনি বাটাভিয়ার (Batavia) প্রাচ্যবিদ্যাপীঠে অনেকদিন ধ'রে কাজ করে অবশেষে ইন্দোচীন দর্শনে এসেছিলেন। ফান-রাং-এ এসে ইনি আমাদের সঙ্গ নিলেন, আমাদের সঙ্গে কৌঠার দেখ্‌বার উদ্দেশ্যে।

ফান-রাং থেকে না-ত্রাং রেলপথে যেতে হয়। প্রায় ১০০ মাইল পথ তিন ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। এ রেলপথ না-ত্রাং থেকে কিছু দূরে গিয়েই শেষ হয়েছে। না-ত্রাং-এর পর আনামের পর্ব্বতমালা বেশী দুর্গম হ'য়ে উঠেছে। ফান্‌-রাং থেকে না-ত্রাং পর্য্যন্ত যে ভূমিভাগ সেটা অনেক নীচু তাই ধন-ধান্যে সুশোভিত। ছোট কয়েকটী নদী এই ভূমিভাগকে নদীমাতৃক ক'রে তুলেছে। এই নদীগুলির ভিতর যেটী সব চেয়ে প্রধান সেটী না-ত্রাং-এর নিকটে সমুদ্রে মিশেছে। নদীর একধারে বর্ত্তমান না-ত্রাং, অন্য ধারে প্রাচীন পো-নগর।

ফান-রাং থেকে সকালে ৮টায় রওনা হ'য়ে আমরা

বেলা প্রায় ১১টায় না-ত্রাং পৌঁছুলাম ও সেখানকার বাংলোতে আশ্রয় নিলাম। আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা ছিল ফরাসী রেসিডেণ্টের গৃহে। না-ত্রাং-এ যে ক'দিন ছিলাম—সে ক'দিন সরকারের অতিথি হিসাবেই কাটিয়েছিলাম। না-ত্রাং স্থানটী বেশ মনোরম। সমুদ্র থেকে বেশ উঁচু ও সুরক্ষিত। এর উত্তর দিক দিয়ে সুপ্রশস্ত নদীটী এসে সাগরে পড়েছে। নদীর পরপারেই উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের উপরে প্রাচীন কৌঠারের ভগ্নাবশেষ। না-ত্রাং-এ অধিবাসীরা সকলেই আনামী। এদিকে কোন চ্যামকেই দেখা যায় না।

চম্পার উপকূলে কৌঠার বোধ হয় হিন্দুদের প্রথম উপনিবেশ। চম্পার সব চেয়ে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি কৌঠার কিম্বা তার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেই পাওয়া গেছে। না-ত্রাং-এর অনতিদূরে বো-চান্ (Vo-can) নামক স্থানে চম্পার সব চেয়ে প্রাচীন সংস্কৃত লেখা পাওয়া গিয়েছে। এই লেখা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগের ব'লে অনুমান করা হয়। এই লেখাতে শ্রীমার নামক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনিই বোধ হয় কৌঠারের প্রথম হিন্দু রাজা ছিলেন। কৌঠারের কিছু উত্তরে চো-দিন্ (Cho-Din) নামক স্থানে

চম্পায় প্রাপ্ত যক্ষ

(পৃঃ ৮৩)

সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পাহাড়ের উপর দু'টী সংস্কৃত লেখা পাওয়া গিয়েছে। এ দু'টী লেখাও খুব প্রাচীন—একটীতে (খৃঃ ৫ম শতাব্দীর) রাজা ভদ্রবর্ম্মণের উল্লেখ আছে, অন্যটীতে "শিবো দাসো বধ্যতে" এই কথার উল্লেখ আছে। অনুমান হয় কোন এক হতভাগ্য শিবদাসকে এইখানে তান্ত্রিক মতে বলি দেওয়া হয়েছিল। মাতৃ-ভূমি-হারা ও পথ-হারা হিন্দুকে ধর্ম্মের নামে অনামের এই সুদূর উপকূলে দুর্গম পর্ব্বতের প্রান্তভাগে হত্যা করা হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত অক্ষরে লেখা প্রস্তরফলক ও এই নির্জ্জন পর্ব্বত আজও সে বর্ব্বরতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সব চেয়ে বেশী শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে পো-নগরে; কারণ সেইটীই ছিল প্রাচীন কৌঠারের রাজধানী। প্রাচীন লেখমালায় কৌঠারের যে রাজধানীর উল্লেখ আছে তা'র নাম হচ্ছে ইয়াং-পু-নগর (Yangpu-Nagar)। এই নগরের দেবতার * উদ্দেশ্যে যে সমস্ত

* এই নগর দেবতার নামও ইয়াং-পু-নগর দেওয়া হয়েছে। ইয়াং-পু-নগর কথাটীর অর্থ "নগর-ভগবতী" বা "রাজ্যেশ্বরী"। পো-নগরের মন্দিরে প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঠিক কে ছিলেন তা' বর্ত্তমানে বলা যায় না। প্রাচীন লেখমালাতে এঁকে "ভগবতী" এবং "কৌঠার দেবী" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল সেগুলিকেই বর্ত্তমানে পো-নগরের মন্দির বলা হয়। প্রাচীন পু-নগর ও বর্ত্তমান পো-নগর যে এক তা'তে কোন সন্দেহ নেই।

কৌঠার এক সময়ে খুব পরাক্রমশালী হ'য়ে উঠেছিল এবং কৌঠারের রাজারা অনেক সময় সমস্ত চম্পার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। প্রাচীন পু-নগর কিছুকালের জন্য সমস্ত চম্পার রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠেছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত এই সমৃদ্ধি অটুট ছিল।

* * * *

আমরা একদিন মধ্যাহ্নে পো-নগরের মন্দির দেখতে বের হ'লাম। আকাশে তখন অল্প অল্প মেঘ দেখা দিয়েছে। বৃষ্টি হ'বার খুব আশঙ্কা নেই ভেবে আমরা সেদিন মন্দির দেখ্‌বার সঙ্কল্প করলাম ও না-ত্রাং অতিক্রম করে নদীর মোহানায় এসে পৌঁছুলাম। পো-নগরে যেতে হ'লে এখানে পার হ'তে হয়। অভিনব দৃশ্য—ডাইনে বিশাল সমুদ্র এবং পেছনে না-ত্রাং-এর ক্ষুদ্র নগর। নগরের নীচুতেই সমুদ্রতটে সারি সারি সাম্পান বাঁধা রয়েছে। বিদেশী বণিকেরা যেমনি ভাবে সেকালে কৌঠারে বাণিজ্য করতে আস্‌ত এখনো তেমনি আসে।

এদের সঙ্গেই হিন্দুরা প্রথম কৌঠারের উপকূলে এসেছিলেন ও এই নদীর মোহানায় তাঁদের প্রথম উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। নদী মোহানার নিকট সুপ্রশস্ত। পর পারেই উঁচু পাহাড়। তার উপর পো-নগরে মন্দির চূড়া দেখা যাচ্ছে। ছোট নৌকায় নদী পার হ'তে হয়। নৌকায় উঠ্‌তেই অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল ও আমরা ভিজ্‌তে স্থরু করলাম। পর পারে পৌঁছুবার পূর্ব্বেই বৃষ্টিপাত খুব বেশী হ'য়ে উঠ্‌ল। বৃষ্টিতে এমনি ভাবে ভিজে সকলে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পো-নগরের পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলাম। নদীর ধার দিয়ে পাহাড়টী খাড়া উঠেছে; এক পাশ দিয়ে পথ। প্রাচীন কালে নদীর ধার থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে উঠ্‌বার জন্য প্রশস্ত সোপান ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এখন তার ভগ্নাবশেষ মাত্র চোখে পড়ে। পাহাড়ের চারদিকে এখন ভীষণ বন। পথের তুই ধার লতাগুল্মে ভ'রে উঠেছে। বৃষ্টিতে এই চড়াই পথ এত পিছল হ'য়ে উঠেছিল যে আমাদের অতি সন্তর্পণে পাহাড়ে আরোহণ করতে হয়েছিল। উপরে উঠ্‌লেই সুপ্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছান যায়। প্রাঙ্গণের তু'ধারে ছোট ছোট কয়েকটী মন্দির, মাঝখানে "কৌঠার দেবীর"

বৃহৎ মন্দির। চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেই মনে হয় স্থানটী সেকালে বেশ সুরক্ষিত ছিল। যুদ্ধবিগ্রহের সময় কৌঠারের রাজারা এখানে ধন-রত্ন রক্ষা করতেন। এই জন্যই পো-নগরের মন্দিরের উপর প্রায়ই বিদেশী শত্রুর লোলুপ দৃষ্টি পড়ত। না-ত্রাং-এর সমতল ভূমিতে শত্রুকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। এই জন্যই কৌঠারের রাজারা পাহাড়ের উপর পো-নগরের এই মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন। চম্পা যখন একচ্ছত্র রাজার অধিকারে এসেছিল তখনও অমরাবতী থেকে চম্পার রাজারা পো-নগরের তত্ত্বাবধান করতেন ও অনেক সময়ে এই মন্দিরে আশ্রয় নিতেন। মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে সমুদ্রে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহের সময় এখান থেকে শত্রুর নৌবহর পর্য্যবেক্ষণ করা চলত।

* * *

পো-নগরের মন্দিরগুলি প্রায় অটুট্ রয়েছে। শুধু ছোট দু'একটী মন্দির জীর্ণ। প্রধান মন্দিরটীর সংস্কার করা হয়েছে। এ মন্দিরে শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। পাণ্ডুরঙ্গের শ্রীলিঙ্গ-রাজের মন্দিরের মতই প্রস্তরে নির্ম্মিত। বাইরে যে সামান্য

চম্পা
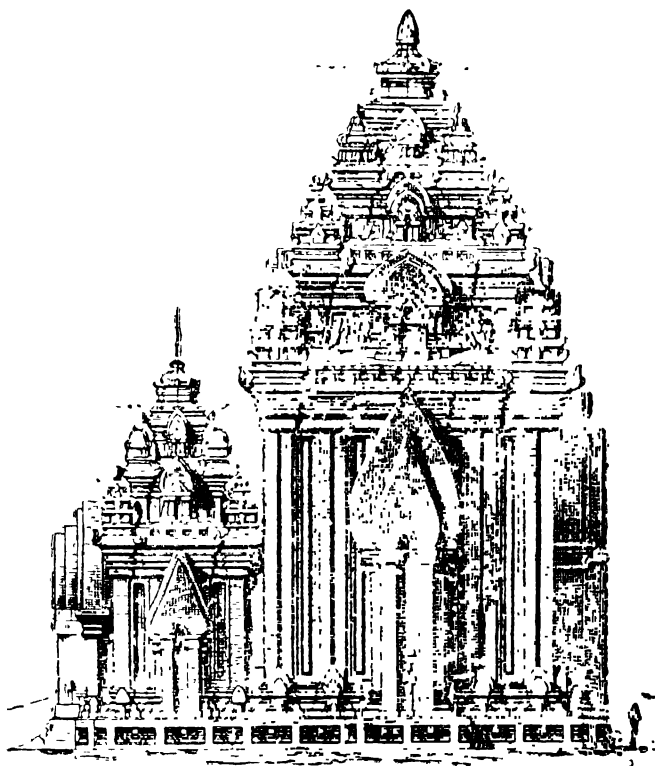
পো-নগরের মন্দির।

ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ছিল তা' এখন লোপ পেয়েছে। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "কৌঠার দেবীকে" আর কেউ এখন পূজা দেয় না। দেবার মত কেউ এখানে নেই। চ্যামেরা বিতাড়িত। মন্দির এখন একজন আনামীর তত্ত্বাবধানে আছে। মন্দিরে যে সব ধনরত্ন পাওয়া গিয়েছিল তা' বর্ত্তমানে হ্যানয়ের প্রাচ্যবিদ্যাপীঠের মিউজিয়মে সংরক্ষিত হয়েছে। প্রাচ্যবিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন।

এই মন্দিরে যখন আমরা উপস্থিত হ'লাম তখন সকলেই শীতে কাঁপছি। মন্দিররক্ষকের অনুপস্থিতিতে তাঁ'র স্ত্রীই আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আনামী-রমণী বিশিষ্ট ভদ্রতাসহকারে আমাদের জন্য মন্দিরের একপ্রান্তে আগুন তৈরী ক'রে দিলেন, ও চা নিয়ে এলেন। শরীরটাকে একটু গরম ক'রে নিয়ে আমরা মন্দির দর্শনে মনোনিবেশ করলাম। এই মন্দিরের সংস্কারক আঁরি পার্মাঁতিয়ে (Henri Parmentier) আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তন্ন তন্ন ক'রে তাঁর মন্দির সংস্কারের প্রথা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

পো-নগরের মন্দির ঠিক কোন সময়ে নির্ম্মিত হয়েছিল তা' বলা যায় না। সংস্কৃতলেখমালায় এক

কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে। মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এখানে প্রথমে এক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করা হয়। লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা বিচিত্রসাগর। লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দ্বাপর যুগের ৫৯১১ বর্ষে। এই কিম্বদন্তীর ভিতর ঐতিহাসিক সত্য কিছু নেই। সুধু এইটুকু অনুমান হয় যে কৌঠারের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ সগরবংশের সহিত নিজেদের সম্বন্ধস্থাপনের জন্য এই কিংবদন্তীর উদ্ভাবন করেছিলেন।

পো-নগরের মন্দিরে প্রথমে পাণ্ডুরঙ্গের শ্রীলিঙ্গ-রাজের মত যে এক মুখলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা'তে কোন সন্দেহ নেই। ৬৯৬ শকে (খৃঃ অঃ ৭৭৪) মালয়বাসীরা সমুদ্রপথে এই মন্দির আক্রমণ করে। মন্দির ধ্বংস ও ধন-রত্ন সমূহ লুণ্ঠন করে। সত্য-বর্ম্মণ শত্রুর নৌবহর অনুসরণ ক'রে শত্রুকে জলযুদ্ধে পরাজিত করলেন বটে কিন্তু মুখলিঙ্গ সমুদ্রের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হ'ল। দেবতার উদ্ধারসাধন আর সম্ভব হ'ল না।

সত্যবর্ম্মণ বিষাদ ভরা হৃদয়ে ফিরে এলেন। জয় গৌরব তাঁর কাছে বৃথা মনে হ'ল। কৌঠারে অধিষ্ঠাতা দেবতা চম্পার সব চেয়ে বড় রত্নকে ফিরিয়ে আনতে না

পারায় চম্পার যশোগৌরব তাঁর কাছে অস্তমিতপ্রায় মনে হ'ল। পুরোহিতদের সহিত পরামর্শ ক'রে পুনরায় মন্দির নির্ম্মাণ ও নূতন মুখলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হ'ল এবং তা'র নাম দেওয়া হ'ল শ্রীসত্যমুখলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের পাশে ভগবতী কৌঠার দেবী ও গণেশের প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। চম্পার রাজারা আনামীদের আক্রমণের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই মুখলিঙ্গ ও কৌঠার দেবীকে পূজা দিয়েছিলেন। পো-নগরের বর্ত্তমান মন্দির রাজা সত্যবর্ম্মণের প্রতিষ্ঠিত ব'লেই অনুমান করা হয়।

কৌঠার দেবীর মূর্ত্তি অর্দ্ধনারীশ্বরের। ইনিই পো-নগরের প্রধান দেবতা ছিলেন। রাজা হরিবর্ম্মণের সময় (৮১৩—৮১৭ খৃঃ অঃ) কৌঠার দেবীর মন্দিরের পাশে অন্যান্য মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল, এবং মণ্ডকলিঙ্গ (শিবলিঙ্গের নামান্তর), শ্রীবিনায়ক ও শ্রীমলদাকুঠার দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এইরূপে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত চম্পার অধিপতিরা পো-নগর মন্দিরের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলছিলেন ও কৌঠার দেবীর পূজা দিয়ে আস্‌ছিলেন।

উত্তর থেকে আনামীদের আক্রমণে চম্পার অধিপতিরা উদ্বাস্ত হ'য়ে অমরাবতী ও বিজয় ছেড়ে

দিয়ে যখন দক্ষিণে স'রে আস্‌ছিলেন তখন কৌঠার ও পাণ্ডুরঙ্গই তাঁদের শেষ আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দীর শেষ ভাগে চম্পার রাজবংশের শেষ প্রতিনিধি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হ'য়ে এখানেই তাঁর শেষ জীবন যাপন করেছিলেন।

পো-নগরও তা'র নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থান দেখেই আমাদের চম্পা দেখা শেষ হ'ল। অমরাবতী ও বিজয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌বার আশা এবারবার মত ত্যাগ করতে হ'ল। বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার স্থলপথে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না জলপথেও সমস্ত স্থান দেখা বহু সময় সাপেক্ষ। সুতরাং সাইগণে ফিরে আমরা হ্যানয় রওনা হব ঠিক হ'ল। আচার্য্য লেভি, পার্মাঁতিয়ে প্রভৃতির অন্যপথে হ্যানয়ে মিলিত হবার কথা। বৃদ্ধা ওলন্দাজ কুমারী ভ্যানগুর (Van Goor) পো-নগরের মন্দির দেখ্‌বার দিন জলে ভিজে এমন ভয় পেয়েছিলেন যে দু'দিন তিনি শয্যাত্যাগ ক'রে বাইরেই আসেন নি। সাইগণ ফিরিবার আশায় তিনি খুব আনন্দই লাভ ক'রলেন। সেখানে গেলেই পথশ্রম দূর হবে ভরসায়।

সাইগণের গাড়ী না-ত্রাং থেকে ভোর বেলা ছাড়ে,

প্রায় ৪টায়। সায়াহ্নে ফরাসী রেসিডেণ্ট মহাশয়ের বাড়ীতে ভূরিভোজন ক'রে তাঁ'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম ও রাত্রি জেগে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলাম। ৪টায় উঠ্‌তে ভাবনায় বিশেষ ঘুম হ'ল না। ভোর বেলা আমরা হাতমুখ ধুয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। কিছূদূর যেতে না যেতেই থাম্‌তে হ'ল। রাস্তা সমস্ত জলে ভ'রে গেছে। দু'দিন ধ'রে অনবরত বৃষ্টি হ'বার ফলে সমস্ত পথ ডুবে গেছে। এতটুকুও অগ্রসর হবার উপায় নেই। হতাশ মনে আমরা বাংলোতে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। তখনও একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। কুমারী ভ্যানগুর বিশেষ চিন্তাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন, ও সকাল হ'তেই পার্মাঁতিয়েকে খবর পাঠালেন।

দুপুর বেলা আমরা খেতে বসেছি। হঠাৎ পার্মাঁতিয়ে খবর দিলেন যে আমাদের সাইগণ যাওয়া অসম্ভব। প্রায় ত্রিশ মাইল ধ'রে রেলপথ জল-প্লাবনে ভেসে গেছে। অথচ সাইগণে না গেলেও নয়। সেখানে হোটেলে আমাদের জিনিষপত্র ফেলে এসেছি। কুমারী ভ্যানগুর মনে এতই আঘাত পেলেন যে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠলো। বর্ষণও কিছু হ'ল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহ'লে কি হবে?" এতটা কাণ্ড হবে পার্মাঁতিয়ে আশঙ্কা করেন নি। তিনি লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লেন যে "ভয়ের কোন কারণ নেই। জিনিষপত্র কিছু হারাবে না।" তিনি জাহাজে আমাদের জিনিষপত্র তুলে দেবার জন্য সাইগণে পূর্ব্বেই তার করেছিলেন। না-ত্রাং-এর কিছু উত্তরে হোন-লোং (Hon-long) নামক বন্দরে জাহাজ ধরবার কথা। সুতরাং সাইগণে না ফিরতে পারলেও হোন-লোং-এ আমাদের জাহাজ ধরবার উপায় ছিল। পার্মাঁতিয়ের আশ্বাসবাণীতেও কুমারী ভ্যানগুর বিশেষ প্রফুল্লতা লাভ করলেন না।

পরদিন রেলপথে আমরা হোন-লোং-এ রওনা হ'লাম। না-ত্রাং থেকে হোন-লোং পর্য্যন্ত রেলপথ ভালই ছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ। হোন লোং-এর বাংলোতে রাত্রি-বাস ক'রে পরদিন সকালে আমরা জাহাজে উঠলাম। জাহাজে উঠে যখন কুমারী ভ্যানগুর নিজের জিনিষপত্র দেখতে পেলেন তখন আশ্বস্ত হ'লেন ও মুখে তাঁ'র হাসি ফুটে উঠলো।

আমরা হ্যানয় যাত্রা করলাম।

ভারত ও ইন্দোচীন

সে দিন সকালেও টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশ কুজ্ঝটিকায় ভরা। চীন সাগরের বক্ষ তরঙ্গে উদ্বেলিত। চম্পার উপকূলভাগ ত্যাগ করবার সময় মনের উপর যে বিষাদ রেখা পড়েছিল তা' আজও মোছে নি। চম্পার এ উপকূলভাগ থেকে হিন্দু বিতাড়িত হয়েছে—ভারতের নাম এখান থেকে লোপ পেয়েছে। এ প্রদেশ ছিল ভারতের উপনিবেশ—হিন্দু এ উপকূল-ভাগে প্রথম সভ্যতা বিস্তার করে। এ প্রদেশের আদিম অধিবাসীকে হিন্দুই প্রথম উন্নত করে। সে সভ্যতার ধারা এখানে আজও বর্ত্তমান—হিন্দুই শুধু এখানে নেই।

ঐতিহাসিকের মানসপটে অনেক চিত্রই আজ প্রতিফলিত হয়। মনে পড়ে—চম্পার অবনতির যুগে আনামী ও দস্যুর আক্রমণে ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে কেমন ক'রে এক হিন্দুরাজা এই উপকূলভাগ ত্যাগ করেছিলেন। রাজকুমার সূর্য্যবর্ম্মণ ছিলেন চম্পার হিন্দুরাজবংশের কুমার। ভারতীয় ক্ষত্রিয়ের রক্ত তাঁ'র ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত। ভারতীয় গুরুর নিকট তিনি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছিলেন। চম্পার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করে শেষে কুচক্রীর

চক্রান্তে মাতৃভূমি পাণ্ডুরঙ্গ থেকে বিতাড়িত হ'লেন। বিজয় ও অমরাবতী থেকেও বিতাড়িত হ'য়ে তিনি দেশত্যাগ করলেন (১২২৩ খৃঃ অঃ)। দু'শো সাম্পানের নৌবহরে ভক্তরা তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। শ্রীবিনয় বন্দর থেকে তিনি কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন—এই বিশাল চীন সাগরের অশান্ত বক্ষের উপর দিয়ে তাঁর দুই শত সাম্পান পাল তুলে কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়ে কোথায় যে চ'লে গেল—সে কথা কেউ জানে না।

যে পর্ব্বতের উপর "শিবো দাসো বধ্যতে" লেখা রয়েছে সে পর্ব্বত এখনো চোখের অন্তরাল হয় নি। হিন্দুর উপনিবেশ স্থাপনার প্রাক্কালে যে-দিন সেই পথহারা শিবদাসকে চম্পার এই উপকূলে হত্যা করা হয়েছিল সেদিনটা ও বোধ হয় এমনি বিষাদভরা ছিল। নররক্তে চম্পায় যে হিন্দু-দেবতাকে তান্ত্রিক হিন্দু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী চম্পার দরিদ্র অধিবাসীদের রক্ত দিয়েই বিজেতা আনামী সে দেবতাকে মন্দিরচ্যুত করেছে। এই নিপীড়িতকে রক্ষা করবার জন্য কোন হিন্দুই আর সেদিন এ উপকূলভাগে আসেন নি।

টঙ্কিন

হোন-লোং থেকে টঙ্কিনের বন্দর হাই-ফংএ জাহাজ দু'দিনে পোঁছে। হাই-ফং টঙ্কিনের প্রধান বন্দর। নদীর মোহনায় অবস্থিত। এই নদীর নাম Fleuve Rouge বা লাল নদী। হাই-ফং সহরটী ছোট, প্রায় ২৫।৩০ হাজার লোকের বাস। চীনের ইউনান (Yun-nan) প্রদেশের সঙ্গে নদী পথে ও রেলপথে হাইফংএর যোগাযোগ রয়েছে; তাই ইউনানের আমদানী রপ্তানী হাইফংএর পথেই চলে।

আমাদের গন্তব্য স্থান হ্যানয়ে হাই-ফং থেকে রেলপথে যেতে হয়, প্রায় দু'ঘণ্টার পথ। হাই-ফং-এ আমাদের জাহাজ সকালেই পৌঁছুল, তাই সেখানে

অপেক্ষা না করে আমরা ট্রেনে হ্যানয় যাত্রা করলাম। বেলা ১১টার মধ্যে হ্যানয় পৌঁছে পূর্ব্বেকার নির্দ্দেশমত সেখানকার প্রাচ্য বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষের অতিথি হ'লাম।

হ্যানয় সাইগণের পর ইন্দোচীনের সব চেয়ে বড় সহর। লাল নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের বাস। রাস্তা ঘাট সব ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে আধুনিকভাবে তৈরী তা'ছাড়া সহরে বিজ্‌লির আলো, ট্রাম, কলের জল বর্ত্তমান কালের উপযোগী হোটেল প্রভৃতি সবই রয়েছে! হ্যানয় টঙ্কিনের প্রধান সহর। কিন্তু এক হিসাবে এটী সমস্ত ইন্দোচীনের প্রধান সহর বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। হ্যানয়েই হচ্ছে ফরাসী গবর্ণর জেনারেলের আবাসস্থল। সেই সূত্রে ফরাসী শাসনতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ; ব্যাঙ্ক ঔপনিবেশিক সৈন্য (Colonial army) প্রভৃতির সমাবেশ।

টঙ্কিন প্রাচীনকালে ছিল চীন সাম্রাজ্যের একটী প্রদেশ। চীন সম্রাটের প্রতিনিধিরাই এ প্রদেশ শাসন করতেন। চীনেদের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভারত ও চীনের প্রথম আদান প্রদানের

যুগে ভারতও অন্যান্য দেশের অর্ণবপোতে টঙ্কিন থেকে বিদেশীরা স্থলপথে দক্ষিণ চীনের নানাস্থানে যাতায়াত করত। এই যুগে যে সব ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু টঙ্কিনে এসে ধর্ম্মপ্রচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁদের অনেকের নাম চীনেদের প্রাচীন ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে। পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশীরা ক্যাণ্টনে অবতরণ করতেন ও সেখান থেকে চীনদেশের নানাস্থানে যেতেন।

হ্যানয়ের প্রাচ্য বিদ্যাপীঠ (Ecole Francaise d' Extreme Orient), ইন্দোচীনে ফরাসীদের একটী বড় কীর্ত্তি। এই বিদ্যাপীঠ ১৯০১ সালে স্থাপিত হয় ও অধ্যাপক লুই ফিনো (Louis Finot) এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ন। প্রতি বৎসর ৪।৫টী করে উপযুক্ত ছাত্র বৃত্তি পেয়ে এখানে অধ্যয়ন করে আস্‌ছেন এবং তাঁদের ভিতর থেকেই অনেক বড় বড় পণ্ডিত বেরিয়েছেন— যেমন পেলিও (Paul Pel!iot), আঁরি মাস্‌পেরো (Henri Maspero), সেদেস্‌ (Coedes) পশিলুস্কি, (Przyluski), দোমিয়েভিল (Deumieville)। পেলিও, মাস্‌পেরো প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের সমবেত চেষ্টায় হ্যানয়ের বিদ্যাপীঠে প্রাচীন চীনা পুথি

ও বইয়ের যে সংগ্রহ হয়েছে তা' পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দুর্লভ। এই বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষের উৎসাহে ও সাহায্যেই অধ্যাপক পেলিও ১৯০৬ সালে মধ্য এসিয়ায় যাত্রা করেন ও প্রায় দু'বৎসর ধরে মধ্য এসিয়ার নানা স্থানে ঘুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে খণ্ডিত পুথি, ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলার নানা নিদর্শন উদ্ধার করে আনেন। যাঁরা মধ্য এসিয়ার প্রাচীন তত্ত্বের খবর রাখেন তাঁরা সকলেই অধ্যাপক পেলিওর এ সমস্ত আবিষ্কারের যথাযথ মূল্য জানেন। অধ্যাপক পেলিওর এই আবিষ্কারে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও লাভবান কারণ মধ্য এসিয়ার ভারতীয় সভ্যতার প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধেও এই সব আবিষ্কার থেকে অনেক খবর পাওয়া যায়। হ্যানয়ের প্রাচ্য বিদ্যাপীঠের পণ্ডিতেরাই ইন্দোচীনের প্রাচীন সংস্কৃত লেখমালার আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার করেছেন এবং প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির ইতিহাস আলোচনা করেছেন ও করছেন। সত্যকথা বল্‌তে ইন্দোচীন ও চীনের প্রাচীন ইতিহাস যথাযথ ভাবে আলোচনা করতে হ'লে হ্যানয়ের বিদ্যাপীঠই শ্রেষ্ঠস্থান।

হ্যানয়ে যে ক'মাস ছিলাম বিদ্যাপীঠের সংলগ্ন গৃহে পণ্ডিতদের সাহচর্য্যে থাক্‌বার ও প্রাচ্য বিদ্যাপীঠের

পুস্তকালয়ে অধ্যয়ন করবার সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিলাম। লুই ফিনো, পর্মাঁতিয়ে ও চীনাভাষার অধ্যাপক ওরুসো (Aurousseau) সকলেই সাহায্য করবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাক্‌তেন। তাঁদের ভিতর অধ্যাপক ওরুসোর অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়েছে, ফিনো ও পর্মাঁতিয়ে বার্দ্ধক্যহেতু অবসর নিয়েছেন। বর্ত্তমানে বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ হচ্ছেন সেদেস্ (Coedes)—তিনিও ভারতীয়দের আন্তরিক বন্ধু। আজীবন তিনি প্রাচীন শিলালেখ, ও সংস্কৃত, পালী প্রভৃতি ভাষার আলোচনায় কাটিয়েছেন এবং ইন্দোচীন, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

এই প্রাচ্য বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষদের প্ররোচনায়ই হ্যানয়ে একটি মিউজিয়ম স্থাপিত হয়েছে, আর এই মিউজিয়মের প্রায় তিনভাগ ইন্দোচীনের হিন্দু ভাস্কর্য্যে পূর্ণ। বর্ত্তমানকালে টঙ্কিনে প্রাচীন ভারতের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। চম্পার হিন্দুরাজারা কোন কোন সময়ে নিজেদের দেশের সীমা অতিক্রম করে টঙ্কিনের কতকাংশ জয় করেছিলেন বটে, কিন্তু সে জয় ছিল ক্ষণস্থায়ী। তাই হিন্দু সভ্যতার কোন

সত্যকার প্রভাব টঙ্কিনে পৌঁছায় নি। অবশ্য টঙ্কিনের অধিবাসী আনামীরা অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, টঙ্কিনের নানা স্থানে বহু বৌদ্ধমন্দিরও রয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের এ প্রসার হচ্ছে চীনদেশ থেকে।

বস্তুতঃ আনামীরা চীনেদেরই জ্ঞাতি। তা'দের সভ্যতার যা' কিছু উপাদান তা' তা'রা চীনেদের থেকেই পেয়েছে। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকে, যখন আনামীর প্রথম সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তখন দক্ষিণ চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রবাহ চলেছে, সেই প্রবাহই টঙ্কিনের আনামীদের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল।

হ্যানয়ে যে সব বৌদ্ধমন্দির আছে তন্মধ্যে লিয়েন-ফাই-তু (Lien-Phaitu), বাক্-মা (Back-ma) ও ত্রান-বু (Tran-vu) প্রভৃতি মন্দিরই প্রসিদ্ধ। লিয়েন-ফাই-তু আধুনিক মন্দির, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে স্থাপিত। এই মন্দিরে কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সমাধি রয়েছে। সাধনরত আনামী ভিক্ষুদের জন্য এই মন্দিরের সংলগ্ন একটী বিহারও আছে।

'বাক্-মা' মন্দির খুব প্রাচীন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে স্থাপিত। বাক্-মা কথার অর্থ 'শ্বেত অশ্ব'। মন্দিরের

এরূপ অদ্ভুত নাম হবার একটী কারণ আছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষ থেকে দু'জন বৌদ্ধভিক্ষু চীন-দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে যান। তাঁদের নাম হচ্ছে ধর্ম্মরক্ষ ও কাশ্যপ মাতঙ্গ। উভয়ে ভারতবর্ষ থেকে নানা পুথিপত্র নিয়ে নানাস্থান পর্য্যটন করে চীনদেশের রাজধানী লো-ইয়াং নগরে উপনীত হন। ধর্ম্মপ্রচারে কতকটা অগ্রসর হ'লে তাঁরা চীনের রাজধানীতে একটি বৌদ্ধমন্দির স্থাপনা করেন ও নিজেদের সংগৃহীত বৌদ্ধ-শাস্ত্র সেই মন্দিরে রক্ষা করেন। প্রবাদ যে এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি তাঁরা একটী সাদা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেই থেকে মন্দিরের নামকরণ হ'ল পো-মার (শ্বেত-অশ্বের) মন্দির। 'বাক্-মা' চীনা 'পো-মা' কথারই আনামী উচ্চারণ। চীনদেশের প্রথম স্থাপিত বৌদ্ধমন্দিরের অনুকরণেই হ্যানয়ে এই মন্দিরের স্থাপনা ও নামকরণ হয়েছিল মনে হয়। এই মন্দির ছিল প্রাচীন আনামী রাজাদের রাজধানীর কেন্দ্রস্থল, আর তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের নগরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার স্থানও এই মন্দির। তা'ই এখনও আনামীরা এই মন্দিরের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ভক্তি দেখিয়ে থাকে।

ত্রান্-বুর মন্দিরকে সাধারণতঃ Temple of Grand

Buddha বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মন্দিরে স্থাপিত বুদ্ধমূর্ত্তি বিশেষ বড় নয়। মন্দির স্থাপিত হয়েছিল একাদশ শতকে। মন্দির মনোরম স্থানে অবস্থিত একটী ছোট হ্রদের নির্জ্জন তটদেশে।

এ ছাড়া হ্যানয়ে আরও অনেক ছোট ছোট বৌদ্ধ-মন্দির আছে। আনামীদের মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়ন বর্ত্তমানে খুব প্রগাঢ় ভাবে না চল্‌লেও চলে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের চীনা থেকে আনামী অনুবাদই আনামী ভিক্ষুরা পাঠ করেন। এক সময়ে সমস্ত চীনা বৌদ্ধ ত্রিপিটকের আনামী অনুবাদ করবার চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য আনামের রাজাদের সাহায্যে ও উৎসাহে। চীনা ত্রিপিটকের কিয়দংশ অনূদিত হয়েছিল। সে সব অনুবাদ এখনও আনামে দুর্লভ নয়।

আনামী বৌদ্ধধর্ম্ম যে নির্জ্জলা এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। কারণ আনামীদের প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস পূরামাত্রায় এই বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। তাই আনামী বৌদ্ধধর্ম্মে বহু উপদেবতার প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। অনেক স্থানেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের সঙ্গে সেই সেই স্থানের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা পূজা পেয়ে আসছেন।

ভারত ও ইন্দোচীন

আনামী জাতির কতকগুলি প্রশংসনীয় গুণ আছে—সে গুলি প্রতি বিদেশীরই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ তা'রা কর্ম্মঠ ; চীনা ও জাপানীদের মতই তা'রা খাট্‌তে পারে। টঙ্কিন, আনাম ও কোচীন-চীনে বহু পরিমাণে ধান হয় ও চা'ল বাইরে রপ্তানি হয়। এই চাষ বেশীর ভাগ আনামী কৃষকদের হাতে। কারু-শিল্পে চীনা ও জাপানীদের ন্যায় এ'দের একটা সহজ অধিকার আছে। তাই কাঠ, লাক্ষা ও সূচের নানাবিধ শিল্প এদের ভিতর এখন ও সম্পূর্ণভাবে জীবিত রয়েছে। কোন আনামী গৃহ দেখলেও খুশী হ'তে হয়। কাঠের ছোট বাড়ী, তা' সাজিয়ে গুছিয়ে ও পরিষ্কার করে রাখতে এরা জানে। কম্বোজ, শ্যাম ও কোচীন-চীনের অধিবাসীদের এ প্রবৃত্তি খুব কম। তারপর সত্যকথা বল্‌তে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ এখনো আনামীরা ভোলেনি। তাই ইন্দোচীনে যা কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন চল্‌ছে তা' আনামীদের চেষ্টায়। এখনও মাঝে মাঝে আনামীরা অস্ত্রধারণের চেষ্টা করে থাকে ও তিন চারি বৎসর পূর্ব্বেও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের সে জন্য উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে হ'য়েছিল। যা' হোক বেশীর ভাগ আনামীরা Constitutional means বা আইন সঙ্গত উপায় অবলম্বন করেই স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করছেন ও অনেক বিষয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছেন।

শেষ